ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা

তরু দত্ত

পদ্মিনী সেনগুপ্ত

অনুবাদ

সুধীরকুমার চৌধুরী

সাহিত্য অকাদেমি

নতুন দিল্লী

সূচী

'দেশে দেশে মোর দেশ আছে'

অন্য দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, এমন কি কোনো কোনো দেশ সম্বন্ধে বৈরীভাবাপন্ন, অথচ সাহিত্যকৃতির জন্যে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন, এমন লেখক-লেখিকা অনেক আছেন। কিন্তু সব দেশেই তাঁদের দেশ আছে, এই রকম মনোভাব-সম্পন্ন লেখক-লেখিকার সংখ্যা খুবই কম। এঁদেরই সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, এঁদের উপর সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মালিকানা; এঁরা কোন্ ভাষায় লিখেছেন, সেটা তাঁদের মাতৃভাষা কি না, এ-সব প্রশ্ন এঁদের ক্ষেত্রে অবান্তর কেননা এঁরা যাই লিখুন তার মধ্যে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে একাত্মতার পরিচয় থাকবেই।

এই ধরনের মনোভাবের সঙ্গে দুর্লভ একটি কবি-প্রতিভা একসঙ্গে হয়ে মিলেছিল তরু দত্তের মধ্যে, আর এটা ঘটেছিল যখন তিনি নিতান্তই বালিকা-বয়সী। অবশ্য তিনি নিজেকে ভারতীয় এবং শ্যাম-শোভাময়ী গাঙ্গেয় উপত্যকার দুহিতা বলেই ভাবতেন, কিন্তু জাতিগত বা ভাষাগত কোনো পিছুটান বা মানসিক অন্তরায় তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে কোনোদিন আচ্ছন্ন করেনি। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এই দুটি দেশের ভাষাই তিনি খুব যত্ন করে শিখেছিলেন, তারপর স্বধর্মে অবিচল থেকে দুটি সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করেছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টির কাজে এই দুটি দেশই যে তাঁকে প্রথম প্রেরণা জুগিয়েছিল তা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন। কিন্তু সাহিত্যের জগৎসভায় তাঁর দেশকে একটি সম্মানের আসনে বসিয়ে এবং এ কাজে প্রথম অগ্রণীদের একজন হয়ে তরু দত্ত এটাও বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে বাংলাতে লেখেননি বলে তাঁর দেশকে যে তিনি কিছু কম ভালোবাসতেন এমন নয়।

ভারত-ইতিহাসের এমন একটি পর্বে তিনি জন্মেছিলেন, যখন মেকলের 'মিনিট্স্' ও লর্ড্ উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের 'রুলিং' অনুযায়ী নেটিভদের ইউরোপীয় কেতায় শিক্ষা দেওয়া এবং কেবল 'ইংলিশ এডুকেশন'-এর জন্যে সমস্ত বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করার ব্যবস্থা, লোক-শিক্ষা সংক্রান্ত অন্য সমস্ত চিন্তাকে চাপা দিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজী একটি অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে গেল, আর শাসিতদের উপর নিজেদের ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়াটা শাসক গোষ্ঠীর

পক্ষে ঘোরতর অন্যায় হচ্ছিল কি না সে বিচারের মধ্যে না গিয়ে, লোকে এটাকে যুক্তিসম্মত স্বাভাবিক বিধান বলেই মেনে নিয়েছিল যে, দেশের সব শিক্ষিত লোকেরই ইংরেজী শেখা উচিত। সুতরাং যে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে সৃজনধর্মী সাহিত্য রচনায় মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা অসঙ্গত, তাঁদের কাছে তরু দত্তের জবাবদিহি করার কিছু ছিল না। অবশ্য তাঁর এটা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি, যে তাঁর নিজস্ব প্রাচীন প্রাচ্য সাহিত্য খুবই ঐশ্বর্য্যময়, এবং তাঁর উচিত এর সঙ্গে ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের মধ্যে ভালো যা-কিছুর পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তাকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করা। এজন্যে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর পিতার সাহায্য নিয়ে সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

এতে সন্দেহ নেই যে, সময় পেলে তরু দত্ত মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ বেশি করে ভারতীয় হয়ে উঠতেন। কিন্তু এই 'অতি সুকুমার, অচেনা জগতের গানের ফুলটি'কে মৃত্যু অতি অকালে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তবু তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনের মধ্যেই তিনি প্রমাণ রেখে গেছেন, যে তাঁর দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ক্রমশঃ বেশি করে তাঁকে মুগ্ধ করছিল, এবং তিনি 'আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন, যে খ্রীষ্টীয় ধ্যানধারণাগুলি বাইরের জিনিষ কিছু নয়; এ-সমস্ত সেই তাঁরই জিনিষ যাঁর কাছে ইহুদী-অইহুদীতে, মুক্ত মানুষ ও ক্রীতদাসে, ইংরেজ ও বাঙালীতে প্রভেদ কিছু নেই।'[১]

তরুর স্মৃতি পরম দুঃখবহ হয়ে ওঠে যখন মনে হয় কী হতে পারত। বড় বোন অরুর অকাল-মৃত্যু হলে এই রকমেরই এক মনোভাব তরু ব্যক্ত করেছিলেন একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, যার ভাবার্থ: "মুখে বলা আর লিখে বলা যত দুঃখের কথা আছে, কোনোটি লাগে না 'কত ভালো হতে পারত—হল না' এই কথাটির কাছে।"

তরু মারা যান একুশ বৎসর বয়সে। তা সত্ত্বেও এ ধরনের কথা বলা ঠিক হবে না, যা একজন সমালোচক বলেছেন, যে তাঁর সব লেখা ইংরেজী এবং ফরাসীতে হওয়ায় 'তাঁর দ্বিভাষিক মানস তাঁকে কিছুটা ভিন-দেশী, এবং সেই সঙ্গে প্রায় পরিত্যক্ত হওয়ার দুঃখজনক অবস্থাকে আরও বেশি দুঃখজনক করে তুলেছে। বিস্মৃতির কবল থেকে উদ্ধার পাবার যোগ্যতা যদি তাঁর থাকে, যা নিশ্চয়ই তাঁর আছে, তাহলে তাঁর উদ্ধারকর্তাকে অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হবে, কারণ তিনি দেখতে পাবেন, তরু নিজেই তাঁর মূল জন্মভূমির

থেকে বহুদূরে অবস্থিত অপর একটি দেশকে নিজের মনের মতন বলে গ্রহণ করেছিলেন।'[২]

তরু কিন্তু কোনোদিনই পরিত্যক্ত হননি ; এদেশে মাতৃভাষায় না লিখে ইংরেজীতে লিখেছেন এমন আর কেউ নেই বললেই হয়, যাঁকে দেশের পত্র-পত্রিকাগুলি এমন নিষ্ঠার সঙ্গে মনে রেখে চলেছে। ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের পরিচয় সংবলিত বইগুলিতে তাঁকে বিশিষ্টতমদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছিল। বাংলা ভাষায়, ফরাসীতে ও ইংরেজীতে তাঁর জীবনচরিতেরও অভাব নেই। কালের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, এবং যদিও এক শতাব্দীরও বেশি আগে তিনি জন্মেছিলেন, আজও তিনি খুব প্রাণবন্তই রয়েছেন, এবং প্রমাণ করে গিয়েছেন যে তিনি মনে রাখার মতো লেখক-লেখিকাদেরই একজন।

যেটুকু রেখে যেতে পেরেছেন, তাইতেই যাঁর এতখানি জনপ্রিয়তা, আরও সময় পেলে না জানি কী মহৎ কীর্তিই তিনি স্থাপন করে যেতে পারতেন। নাকি তাঁর প্রতিভা ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ক্রমশঃ ক্ষয় পেতে থাকত ? ক্ষণকাল দীপ্তি দেওয়ার পর নিবে যাওয়া উল্কার মতো কি এই আশ্চর্য্য প্রতিভাময়ীর স্বরূপ ? একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর লেখার মধ্যে ফুলের কুঁড়ির যে সদ্য ফোটা ভাবটি ছিল, সেটি কি তিনি হারাতেন ? তাঁর রচনার পরিমাণ এত অল্প যে, এমনিতে মহৎ সাহিত্যিকদের কোঠায় তাঁকে ফেলা যায় না। তরুকে বিচার করতে বসলে সর্বদাই মনে হয়, শোক তাপ আর স্বল্পায়ুজীবন, তাঁর কবিত্ব আর বিদ্যাবত্তা এই সব নিয়ে তাঁর সারা জীবনটা যেন একটা সম্পূর্ণ কবিতারই অংশ।

তাঁর চিঠিপত্র, তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলি এই ভাবটিকেই পরিপুষ্ট করে, কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর সাহিত্যকর্মকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা শক্ত। বিচ্ছিন্ন যদি হত তাহলে তাঁর কবিতাগুলি হয়ত কেবল নিজগুণে কালজয়ী হয়ে উঠতে পারত না। কিন্তু এই দুটিকে মিলিয়ে দেখলে যে মর্য্যাদা এই অপরিণত বয়সের মেয়েটিকে আমাদের দিতে হয় তার দাম কম নয়, যেজন্যে উইলফ্রেড ওয়েন-এর মতো ভাষায় আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে, তরুর জীবনের 'শোচনীয়তাতেই তাঁর কবিসত্তা' নিহিত ছিল।

আরও কোনো কোনো সমালোচকের মনে হয়েছে যে, তরুর দুঃখময় জীবনের সঙ্গে এত বেশি ঘনিষ্ঠ বলেই তাঁর কবিতা এত সমাদর পেয়েছে।

"তরুর জীবনে সৌন্দর্য্য, বিয়োগ-বেদনা এবং দুর্নিবার নিয়তি পরস্পর কাটাকাটি করে রেখাপাত করেছে, তাই তাঁর কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে 'কবিতা' এবং সি. এস. লুইস যাকে 'কবি-পূজা' বলেছেন এ দুয়ের মধ্যেকার সূক্ষ্ম পার্থক্য মনে রাখা কঠিন হয়।...যখন আমরা এমিলি ব্রণ্টে-র কবিতা বা তাঁর ওয়াদরিং হাইট্‌স্ উপন্যাসটি পড়ি তখন আমাদের মনে তাঁর ভবিষ্যৎটি কী রকম হতে পারত তা নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে যায়, এবং সেগুলি নিয়ে আলোচনা চলে। এই আলোচনার মধ্যে খুশি হবার মতো উপাদান যেমন থাকে, বিষাদ-ভারাক্রান্ত করে তুলবার মতো চিন্তাও জাগে মনে। তরুর বেলাতেও ঠিক তাই হয়। হয়ত একটি কবিতা তাঁর চোখে পড়ল যেটি স্বচ্ছন্দে তিনি নিজেই রচনা করতে পারতেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুবাদ-স্পৃহা প্রখর কম্পনে উন্মুখ হয়ে ওঠে; যেমন, হয়েছিল বের াঁজের রচিত এই কবিতাটির বেলায়:

ধরায় একান্ত নিরাশ্রয়, অসুস্থ কুৎসিত ক্ষুদ্র দেহ,
যেন আমি জন্ম অপরাধী, কাছে ডেকে শুধায় না কেহ,
মর্মন্তুদ কী যে যন্ত্রণায় ওষ্ঠ ভেদি ফোটে আর্তস্বর;
সুরে ছন্দে কথা গাঁথ বাছা, সাড়া দিয়ে বলেন ঈশ্বর।

দুঃখ-বেদনা এবং বোধের অগম্য এক অমোঘ নিয়তির করাল মূর্তি ছিল তরুর 'ছায়া-সহচর'।" কিন্তু ঐ একই সমালোচক খুব জোর দিয়ে এ কথাও বলেছেন, 'কবিতাটাই আসল সন্দেহ নেই, কিন্তু কবির দিকেও দৃষ্টি না দিয়ে আমরা পারি না।'"[৩]

বয়স বিবেচনায় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তরুর ছিল অসাধারণ প্রতিভা। তিনটি ভাষাতে, একটির থেকে অন্যটিতে অনুবাদ করে তিনি যাদুকরীর মতো খেলা দেখাতেন। ফরাসী ও ইংরেজী—এই দুটি ভাষা রপ্ত হবার পর তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন এবং দশ মাসের মধ্যেই সংস্কৃত বই পড়া এবং তার থেকে অনুবাদ করার ক্ষমতা তাঁর জন্মায়। তাঁর ইংরেজ বান্ধবী মেরী মার্টিনকে তাঁর একটি চিঠিতে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির গভীরে প্রবেশ করার জন্যে তাঁর দৃঢ় সংকল্প বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন: 'কীর্তি-সমুজ্জ্বল দুটি মহাকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারত, মূল সংস্কৃতে আমার পড়তে ইচ্ছা করে। আমাদের সেই কেম্‌ব্রিজে আবার আমি যখন যাব ততদিনে আমি সংস্কৃতে দস্তুর মতো একজন পণ্ডিত হয়ে উঠব। আঃ,

সেখানে ফিরে যাবার জন্যে কী যে আকুল আকাঙ্ক্ষা আমার মনে!' ভারতবর্ষের বাইরেকার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য যে তাঁর মনকে টানত সে কথা তরু বারবার বলেছেন কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর ভারতীয় পরিবেশে ফিরে গিয়েছেন।

তরু লিখেছিলেন, 'বাংলা যে জানে তার পক্ষে সংস্কৃত পড়ে বুঝতে পারা খুব বেশি শক্ত নয়।' এর থেকে মনে হয় তরু বাংলা খুব ভালোই বলতে পারতেন, যদিও বাংলা লিপিটি তাঁর কোনোদিনই তেমন সড়গড় হয়নি। বাংলায় লেখা তাঁর একটিমাত্র চিঠি যা পাওয়া গেছে তাতে তাঁর হাতের লেখা কাঁচা এবং ভুলচুকে ভরা, নিজের নামটিরও বানান লিখতে তিনি ভুল করেছেন।

১৮৭৫-এর ডিসেম্বরে তরু সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেছিলেন, ১৮৭৬-এর সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি এই অতীব বিস্ময়কর খবরটি মেরীকে দেন: 'আমি আশা করছি এবার আর ফরাসীর মাঠে নয়, সংস্কৃতের মাঠে চয়ন করা একটি গুচ্ছ প্রকাশ করতে পারব। ...আজ অবধি মাত্র দুটি মঞ্জরী আমি চয়ন করতে পেরেছি।' 'দি ব্যালাড্‌স্ অ্যাণ্ড্ লেজেণ্ড্‌স্ অব্ হিন্দুস্তান' ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল তরুর মৃত্যুর পর, ১৮৭৮ সালে। বইটি পড়লে বোঝা যায়, কোনো গোপন রসায়নে তরুর মনের দৃষ্টির রূপান্তর ঘটে চলেছিল। ইংরেজ ও ফরাসীদের পক্ষে যা রুচিকর তার থেকে সরে এসে তিনি ক্রমেই বেশি করে ভারতবর্ষকে নিয়ে মশগুল হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে পাকা হাতের রচনা দি ব্যালাড্‌স্-এর কবিতাগুলির বিষয়বস্তু ভারতীয়, এবং এই জাতীয় রচনাতেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। এই সময় থেকে "আমরা দেখতে পাই ইউরোপীয় সাহিত্যের নিজের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে নিষ্ফল, যদিও সাহসিক, প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেষ্টা না করে, প্রেরণা লাভের জন্য তরু তাঁর নিজের জাতি ও দেশের লোক-কাহিনীগুলির দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। প্রাচ্য জগতের কোনও আধুনিক লেখক এশিয়াবাসীদের নীতিবোধ বিষয়ে এমন নূতন ধরনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞান দিতে পারেন নি, যেমনটি পাই তাঁর 'প্রহ্লাদ' ও 'সাবিত্রী' কাহিনী দুটিতে। একটু অবিশ্বাস্য গোছের মনে হলেও, অমন মনোরম ধর্মীয় আখ্যায়িকার নিদর্শনও আর কোথাও আমরা পাইনি, যেমন পেয়েছি 'যোগাদ্যা উমা' গাথাটিতে। এই কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, তাঁর

মায়ের দেশের এই যে গানগুলি তিনি সর্বদা অশ্রুসজল চোখে শুনতেন, সেগুলি যেন নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছেন।"[৪]

সমালোচকরা বারবার তাঁর হিন্দু-সংস্কৃতি-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিহাসের পথে তিনি ছিলেন একটি দিশারীর মতো।'

সুতরাং এটা বলতেই হয়, যে, যদিও ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে তরু খুবই ভালোবাসতেন, এবং ঐ দুটি দেশেরই ভাষার তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের গুণগ্রাহী, তবু তাঁর রূপকল্পলোকে, তাঁর চিন্তায় এবং সেইসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বে তিনি মনে প্রাণে হয়ে উঠছিলেন ভারতীয়। যদিও ভারতবর্ষের পরেই তিনি ফ্রান্সকে ভালোবাসতেন, কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস করবার তাঁর বাসনা ছিল। এর কারণ, তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতবর্ষের চেয়ে সে দেশের মেয়েদের অনেক বেশি স্বাধীনতা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের মেয়েদের বেশির ভাগই ছিলেন বেশ বেশি রকমই পর্দানশীন। তাঁর প্রায়ই মনে হত, বাইরে থাকার সময় যে স্বাধীনতা তিনি এত উপভোগ করতেন, এদেশে নানা বিধিনিষেধে তা ব্যাহত। তিনি তাই খুব খুশি হয়েই, সব দেশ নিয়ে যে পৃথিবী, তারই মানুষ হিসাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে নিজের ভারতীয় হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মের যৌগিক মিলন ঘটালেন। এই ক্ষেত্রেই তাঁর সফলতা সম্ভবতঃ সবচেয়ে লক্ষণীয়। যদিও মনে হয়, এড্‌মণ্ড্‌ গস্‌-এর মতো তিনি ভাবতেন না, যে, 'বিষ্ণু ও শিব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও সেই জাতীয় অন্য নানা ছেলেমানুষি ছেড়ে দিয়ে একটি আরও পরিচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসকে তিনি অবলম্বন করেছিলেন।' তিনি এটা বুঝতেন যে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের পক্ষে বেশি তৃপ্তিকর একটি ধর্মবিশ্বাস দিয়ে নিজের অন্তরকে পরিপূর্ণ করতে পেরেছেন; যীশুখ্রীষ্টের উপর তাঁর অবিচল নির্ভরই রোগযন্ত্রণা ও অকালমৃত্যুর মুখে তাঁকে মনের স্থৈর্য্য বজায় রাখার শক্তি দিয়েছিল; তবু বিষ্ণুকে শিবকে তিনি কখনোই 'ছেলেমানুষি'র পর্য্যায়ে ফেলেন নি। তিনি যে এত আগ্রহ নিয়ে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে তাঁর রচনায় ব্যবহার করতেন তার কারণ, হিন্দুদের কল্পিত দেবদেবী এবং পুরাণে বর্ণিত আদর্শচরিত্র নরনারীদের সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে ছিল গভীর শ্রদ্ধা। বস্তুতঃ স্বয়ং গস্‌ তাঁর স্মৃতিভিত্তিক ভূমিকার শেষের দিকে মন্তব্য করেছেন যে

তরুর গাথাগুলির মধ্যে 'গুরুগম্ভীর অনাড়ম্বর বৈদিক মানসিকতার সুর আমরা শুনতে পাই ; এগুলি ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা থেকে লক্ষণীয় রকম মুক্ত।' অতীতের বৈদিক দেবতারাও তরুর মনোহরণ করেছিলেন।

তরু তাঁর নিজের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সংস্কৃতির পারস্পরিক আদানপ্রদান ঘটিয়েছিলেন। 'শুদ্ধমাত্র নিজের সহজাত প্রতিভার জোরে তিনি সুমহান্ ইংরেজ কবিসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকার অর্জন করেছিলেন।'[৫] তাঁর 'অকাল-পরিণত শিল্পনৈপুণ্য' ছিল বিস্ময়কর এবং তিনি পৃথিবীর মানুষকে শিখিয়ে গিয়েছেন, তারা সবাই ভগবানের একটিই পরিবারের অন্তর্গত।

লেখক ও সমালোচক জেম্‌স্ ডার্‌ম্‌স্টেটর মন্তব্য করেছেন : 'এই বঙ্গ-দুহিতা, এমন সুখ্যাতির যোগ্য ও এমন অদৃষ্টপূর্ব যাঁর প্রতিভা, যিনি জাতি এবং ঐতিহ্যে হিন্দু, শিক্ষায় ইংরেজ মেয়ে, অন্তরে অন্তরে ফরাসী মেয়ে, ইংরেজীতে কবি এবং ফরাসীতে গদ্য-রচয়িত্রী ; যিনি আঠারো বৎসর বয়সে ইংরেজী পদ্যছন্দে ফরাসী কবিদের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন, যাঁর মধ্যে তিনটি অন্তঃপ্রকৃতি এবং তিনটি ঐতিহ্য একসঙ্গে মিশেছিল, যিনি তাঁর শিল্পনৈপুণ্য পরিপূর্ণতা লাভের সম-সময়ে ও তাঁর অসামান্য প্রতিভার উন্মেষের প্রাক্‌কালে কুড়ি বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন, সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এমনই একটি অসাধারণ ব্যক্তিসত্তা যার কোথাও তুলনা নেই।'[৬]

তখনকার বঙ্গদেশ

ব্রিটিশদের বঙ্গদেশ বিজয় এদেশের লোককে প্রতিবাদে যতটা মুখর করে তুলবে বলে মনে করা গিয়েছিল, কার্য্যতঃ তা হল না। আসলে চিন্তা আর আদর্শের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় রকমের ধাক্কার রূপ নিল। ফলে বঙ্গদেশ ও ব্রিটেন পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় এক বন্ধনে বাঁধা পড়ল। বাঙালীদের মধ্যে অনেকের মনে হতে লাগল, ভারতবর্ষের ভালোর জন্যেই বিজাতীয় ধরনের হলেও সাংস্কৃতিক একটা নবজাগরণের প্রয়োজন আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব—যার গভীর প্রভাব তরুর চিন্তার ধরন ও তার আনুষঙ্গিক রচনায় পরে প্রত্যক্ষ করা গেল, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, ভারতবর্ষে হঠাৎ হাতের কাছে পাওয়া ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের ঐতিহ্যময় সম্পদ, পজিটিভিজ্‌ম্—বা যা প্রত্যক্ষগোচর কেবল তাই সত্য বলে গ্রাহ্য—এই মতবাদ, ইউটিলিটেরিয়ানিজ্‌ম্—সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যার কাম্য, ডারুইনিজ্‌ম্ এবং ব্রিটেনে ভিক্টোরীয় যুগের যা বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধিবাদ ও কঠোর নীতি-পরায়ণতার সুন্দর জীবনাদর্শ—এসমস্তই ভারতবর্ষকে, বিশেষ করে বঙ্গদেশকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল।

ইউরোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ আদানপ্রদানের সম্পর্ক এবং ভারতবর্ষের জন্যে গভীর প্রীতি নিয়ে যিনি দেশের জীবনে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করতে লাগলেন, তিনি হলেন শক্তি-প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ আধুনিক ভারতবর্ষের জনক রাজা রামমোহন রায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে গ্রন্থিবন্ধন করে তিনি সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্তন করলেন, সেইসঙ্গে তাঁর ধর্মীয় ও সমাজ-জীবনের দোষত্রুটি দূরীকরণের প্রয়াস, স্ত্রীজাতির প্রতি নানা অসদাচারণ সম্পর্কে তাঁর উদ্‌বেগ, এবং পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে জানতে ও সাধ্যমতো কিছু করতে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, এ সমস্তই ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। শোনা যায়, যে ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রের প্রতীক পতাকা দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি এতই উঁচু একটা লাফ দিয়েছিলেন যে তার ফলে তাঁর একটা পা ভেঙে যায়। তিনি নিজে তাঁর দেশের সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ছিলেন অগ্রদূত। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, ধর্মবিশ্বাস ও

সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতির মধ্যে বঙ্গদেশ নবজন্ম লাভ করেছিল তার সমস্তটারই মর্মস্থলে ছিলেন তিনি।

কয়েকজন সংস্কারকামী মানবহিতৈষী বাঙালীর দ্বারা তাঁদের শুভানুধ্যায়ী ইংরেজদের সহায়তায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল। ছাত্রসংখ্যা ছিল একশত এবং এইটিই ছিল প্রথম ইঙ্গবঙ্গীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বঙ্গদেশের পুনরুজ্জীবনের জন্যে জীবন-উৎসর্গকারী নির্ভীক মিশনারি কেরী, ওয়ার্ড্ এবং মার্শ্‌ম্যান—এর পরের বৎসর শ্রীরামপুর কলেজের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। প্রথম অধ্যক্ষ হয়েছিলেন ডঃ ডাফ্। পরে ডেভিড লেস্টার রিচার্ড্‌সন এই গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে অধিষ্ঠিত হন। দত্তবংশের একজন গোষ্ঠীপতি নীলমণি দত্তের পরম বন্ধু ছিলেন কেরী। নীলমণি দত্ত ছিলেন তরুর প্রপিতামহ। বঙ্গদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার অল্প পরে আঠারো শতকের শেষের দিকের শিক্ষিত ভারতীয় সম্প্রদায়ের ইনি ছিলেন একজন। রাজা রামমোহন রায় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও মিশনারিদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতেন। ভারতীয়দের জীবন এই মিশনারিদের দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিল যে এই সময়কার নূতন সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে লোকে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে একত্র করে মিলিয়ে ভাবত। রাজা রামমোহন রায় স্বয়ং মূল বাইবেল পড়বেন বলে হিব্রু ও গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। বস্তুতঃ বিদেশী ভাষা শেখা এতই বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে সে-সময়কার তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে গ্রীক, লাটিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

নীলমণি ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্পানীর কর্তাদের কোপদৃষ্টি থেকে কেরীকে রক্ষা করেছিলেন (সে-সময়ে মিশনারিদের ভারতে আসতে উৎসাহ দেওয়া হত না)। এই কীর্তিমান্ মিশনারিকে নীলমণি নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কেরী সে-সময়ে ছিলেন কপর্দকহীন, তাঁর পত্নী ছিলেন উন্মাদ এবং তাঁর সন্তানেরাও ছিল অসুস্থ। মানিকতলা স্ট্রীটে রামবাগানে নীলমণির গৃহে কেরী পেয়েছিলেন একটি স্বস্তির আশ্রয় এবং একজন হিন্দু ভদ্রলোকের কাছ থেকে পাওয়া এই উপকার কেরী জীবনে ভোলেন নি। রামবাগানে এই বাড়ীতেই পরবর্তীকালে তরু বাস করেছিলেন। নীলমণি যে হিন্দু পরিবারের মানুষ ছিলেন—তাঁরা ছিলেন সঙ্গতিপন্ন এবং পরমত-সহিষ্ণু। তাঁর বাড়ীতে পূজানুষ্ঠানগুলি হত মহা সমারোহে এবং ভিক্ষা ও অন্য দাতব্যাদিতে তিনি

এত অর্থব্যয় করতেন যে সঙ্গতিহীন হয়ে যেতে তাঁর বেশিদিন লাগে নি। তাঁর নিদারুণ অভাবের দিনে কেরীর পালা এল তাঁকে সাহায্য করার। কেরী তা করেছিলেন বলে শোনা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মিশনারি এবং সৎ কাজে উৎসাহী অন্য ইংরেজদের সঙ্গে তরুর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তরুর জন্মের তিনপুরুষ আগে।

প্রায় এই সময় থেকেই ইংরেজীতে রচনার কাজে ভারতবর্ষীয়দের আগ্রহ দেখা যেতে থাকে। এই সময়কার প্রথম কবিদের মধ্যে ছিলেন হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। ইনি কেরানীর কাজে জীবন শুরু করে পরে হিন্দু কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হয়েছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন ভারতীয় এবং পিতা ছিলেন পর্তুগীজ। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত কবিতাগুলি যে বইটিতে আছে তার নাম হল 'দি ফকীর অব্ জঙ্ঘীরা অ্যাণ্ড্ আদার পোএম্স্'। ডেভিড লেস্টার রিচার্ড্সন ছিলেন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ, এবং 'দি ক্যালকাটা লিটেরেরি গেজেট'-এর সম্পাদক। ইনি নিশ্চয় এই ইণ্ডো-ইংলিশ বা হিন্দ্-ইংরেজীর কবিকে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন। রিচার্ড্সনের 'লিটেরেরি লিভ্স্' সমসাময়িক বাঙালী লেখকদের মনে খুব দাগ কেটেছিল। ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বরে তরু 'দি বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' ডিরোজিও বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ডিরোজিওর পর এলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। ইনি ছিলেন ইংরেজীতে কবিতা-লেখক প্রথম বাঙালী। ইনি ১৮৩০ সালে তাঁর 'শেইর অ্যাণ্ড্ আদার পোএম্স্' নামক কবিতার বইটি প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ সালের পূর্বেকার ইণ্ডো-ইংলিশ সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন মোহন লাল, হাসান আলি এবং পি. রাজাগোপাল। ১৮৪১ সালে রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর 'ওস্‌ম্যান, অ্যান অ্যারাবিয়ান টেল' গ্রন্থটি রিচার্ড্সনকে উৎসর্গ করেন। এটি তিনি কতকটা সাবেকী ঢঙে প্রতি দুই চরণে অন্ত্যমিল, মহাকাব্যে ব্যবহৃত যুগ্মশ্লোকের সাহায্যে রচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তও ছিলেন (১৮২৪-৭৩) হিন্দু কলেজের ছাত্র। কাশীপ্রসাদ ও রাজনারায়ণ দুজনই মাইকেলের আগে ছিলেন রিচার্ড্সনের বিশেষ প্রীতিভাজন ছাত্র। ১৮৪৩ সালে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল কিছুকাল কলকাতার বিশপ্স্ কলেজে পড়েছিলেন তারপর ১৮৪৯ সালে তিনি মাদ্রাজ চলে যান। প্রথমে তিনি ইংরেজীতেই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, পরে পথ

পরিবর্তন করে মাতৃভাষাকেই অবলম্বন করেন এবং একজন অসামান্য কবি ও নাট্যকার রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে তাঁর ইংরেজ বান্ধবী মেরী মার্টিনকে লেখা একটি চিঠিতে তরু মাইকেলের নামোল্লেখ করেন এবং বলেন যে, 'বেঙ্গলী' নামক কাগজটি তরুর সদ্য প্রকাশিত 'এ শীফ গ্লিন্ড্‌ ইন ফ্রেঞ্চ্‌ ফিল্ড্‌স্‌' বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মার্জিত রুচির সুখ্যাতি করতে গিয়ে লিখেছে, 'উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেছেন আমাদের দেশের এরকম পুরুষ মানুষদের মধ্যেও এমনটি দেখতে পাওয়া যায় না।' কিন্তু তাঁকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিবারের লোক বলে ভুল করেছে। তরু বলছেন, 'গতবারের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাটিতে যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা বলা হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমাদের বংশগত কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও সমালোচকের ধারণা সেইপ্রকার বলে মনে হয়।' মাইকেলের জন্মস্থান এবং আদিবাস ছিল যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে।

১৮৫১ সালে তরুর পিতৃব্য হর্ চন্দর ডাট্ (হরচন্দ্র দত্ত) 'ফিউজিটিভ পোএম্‌স্‌' নামক একটি ছোট কাব্যগ্রন্থ এবং সেই সঙ্গে 'রাইটিংস্‌ স্পিরিটিউয়াল, মর‍্যাল অ্যাণ্ড্‌ পোএটিক' প্রকাশ করেন, অন্যদিকে তাঁর আর এক পিতৃব্য গিরিশ চন্দর রচনা করেন 'চেরী ব্লসম্‌স্‌'। তরুর পিতা গোবিন চন্দর ডাট্ (গোবিন্দচন্দ্র দত্ত) 'ডাট্ ফ্যামিলি অ্যাল্‌বাম' নাম দিয়ে যে সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যার সংক্ষিপ্ত ডি. এফ্‌. এ. নামটি লোকে পছন্দ করত বেশি, তাতে এই লেখকদেরও কিছু কিছু রচনা সন্নিবেশিত হয়। বইটি প্রকাশিত হয় লণ্ডনে, এতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওমেশ চন্দর্ ডাট্ (উমেশ চন্দ্র দত্ত) ও তাঁর নিজেরও কবিতা ছিল, প্রকাশক ছিলেন লংম্যান্‌স্‌ গ্রীন। বইটি যে ধরনের প্রশংসা পেয়েছিল তাতে আন্তরিকতার অভাব ছিল, কিন্তু বঙ্গদেশের লেখকদের মনে ঔৎসুক্য জাগাতে পেরেছিল ঠিকই। দত্ত পরিবারের লোকদের ইংরেজী কবিতা রচনায় অত্যন্ত আগ্রহ প্রমাণ করা ছাড়া সাহিত্যিক মর্য্যাদা লাভের যোগ্যতা বইটির প্রায় ছিল না বললেই হয়। তবে বাঙালীদের দ্বারা রচিত ইংরেজী কবিতার এইটিই ছিল প্রথম সঙ্কলন গ্রন্থ এবং মাইকেল মধুসূদনের 'ক্যাপ্‌টিভ লেডি'র মতো বাঙালীদের লেখা 'ইংরেজীতে পুরনো ধাঁচের কবিতা'র নিদর্শন। তরু বা অরু কারও কবিতাই ডি. এফ. এ.-তে স্থান পায় নি, কারণ তাঁরা তখনো ইংলণ্ডে ছিলেন এবং তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট

নিষ্ঠা নিয়ে কবিতা রচনায় হাত লাগানো তখন সম্ভব ছিল না। ১৮৭৩ সালে ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর তাঁরা তাঁদের রচনা প্রকাশের কথা প্রথম চিন্তা করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বেঙ্গল ম্যাগাজিনের জন্য পূর্ণ উদ্যমে লিখতে শুরু করে দেন। অবশ্য ইংলণ্ডে থাকা কালেই তাঁরা ফরাসী কবিতার কিছু কিছু অনুবাদ ইংরেজীতে করেছিলেন।

ডি. এফ্. এ.-র মোট ১৯৭টি কবিতার মধ্যে গোবিন চন্দর লিখেছিলেন ৬৬টি, এবং ওমেশ চন্দর ৭৩টি। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত একটি বিস্মৃতপ্রায় এবং সেই কারণেই কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ রচনারীতি গোবিন অনুসরণ করেছিলেন। অ্যাল্‌বামটি 'কেবল যে একটি গুণাঢ্য পরিবারের স্মারকগ্রন্থ হিসাবেই মূল্যবান্ তা নয়, এর মধ্যে সেইসব ইংরেজ শিক্ষকদের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা কলকাতা শহরে ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন।' অ্যাল্‌বামটি সম্বন্ধে তরুর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। যখন কুইন ম্যাগাজিন থেকে তরুর বান্ধবী মেরী মার্টিনের লেখা তরুর 'শীফ্'-এর সমালোচনা অমনোনীত হয়ে ফিরে এল তখন তরু তাঁকে লিখেছিলেন, 'কুইন তোমার সমালোচনা ফিরিয়ে দিয়েছে জেনে সত্যি যে কি বিশ্রী লাগছে, ভাই। কিন্তু এতে কিছুই এসে যায় না। কুইন সম্বন্ধে আমার ধারণা কোনোদিনই খুব ভালো ছিল না। ডাট্ ফ্যামিলি অ্যাল্‌বাম-এরও ওরা ভালো সমালোচনা করে নি।' পরিবারের আর একজন কবি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্তের পিতৃব্য সোশী চন্দর ডাট্ (শশীচন্দ্র দত্ত)। সোশী চন্দর ১৮৭৮ সালে তাঁর 'দি ভিজন অব সুমেরু অ্যাণ্ড্ আদার পোএম্স্' নামের বইটি প্রকাশ করেন (থ্যাকার স্পিঙ্ক্)। দত্ত পরিবারের লেখকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্যই ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। ইনি ছিলেন তরুর বাবার খুড়তুত ভাইয়ের ছেলে। তরুদের পরিবারের সঙ্গে এঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তরু ও তাঁর বোন অরুর প্রতিভার খুবই সুখ্যাতি এঁর মুখে শোনা যেত।

উনিশ শতক ভারতবর্ষকে কেবল যে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিল তা নয়, জ্ঞানানুশীলনের উন্নততর ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় সংস্কারের দিক্ দিয়ে সবচেয়ে ফলপ্রসূ শতাব্দীরূপে এটি প্রমাণিত হয়েছিল। এই সময়েই ইউরোপীয়রাও অনেকে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে শুরু করেন এবং ভারতবর্ষের বিবিধ বিদ্যার গভীরতায় চমৎকৃত হন। ইতিপূর্বেই

কলকাতায় 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পর স্যার উইলিয়াম জোন্স্, জন উইল্সন, স্যার এডোয়ার্ড্ আর্নল্ড্ এবং স্যার উলিয়াম হাণ্টার—অল্প কয়েকজনেরই নাম করা হল—প্রভৃতির ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি নিয়ে গভীর গবেষণা, ভারতের বাইরে ভারতবর্ষের সুমহান্ এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয় পাবার জন্যে মানুষের মনে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং তরু একটি সুফলপ্রসূ উর্বর নবজাগরণের যুগে জন্মেছিলেন এবং প্রমাণ করে গিয়েছেন যে তিনি এমন একটি অচঞ্চল নক্ষত্র যার দীপ্তি কেবল তাঁর সমকালেই নয়, তাঁর মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে আজও পর্য্যন্ত সাহিত্যের আকাশকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

রামবাগানের দত্তরা

দত্তদের আদিনিবাস ছিল বর্ধমান জেলার আজাপুর গ্রামে। জাতিতে ছিলেন এঁরা কায়স্থ। নীলমণির জন্ম হয়েছিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নীলমণি তাঁর সন্তানসন্ততিদের কাছে কর্ম-প্রেরণার উৎস স্বরূপ ছিলেন। পরিবারের একটি শাখা বর্ধমানেই বসবাস করতে থাকেন, তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীলমণির পিতা কলকাতার রাম-বাগানে চলে আসেন এবং সেখানে অল্প কিছুকালের মধ্যেই একজন উদার-চেতা ধীমান্ ব্যক্তি বলে খ্যাতি অর্জন করেন; তাঁর বদান্যতা এবং অতিথি-বৎসলতায় আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই তাঁর বাড়ীতে আসতেন এবং তাঁর উদার নিরপেক্ষ মতামত শুনে আনন্দ পেতেন বলে বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে ভিড় করতেন।

রসময়, হরিশ এবং পীতাম্বর নামে নীলমণির তিন পুত্র ছিলেন। তরুর পিতা গোবিন চন্দর ছিলেন রসময়ের তৃতীয় পুত্র; রসময়ের অন্য ছেলেদের নাম ছিল কিষেন চন্দর (কৃষ্ণচন্দ্র), কৈলাস চন্দর, হর্ চন্দর (হরচন্দ্র) এবং গিরিশ চন্দর। ঈশান চন্দর এবং সোশী চন্দর নামে পীতাম্বরের দুই পুত্র ছিলেন; ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং বিখ্যাত সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন ঈশানের পুত্র। সেই পুরাতন রামবাগানের কাছে রমেশচন্দ্রের বসতবাটী আজও অবধি টিকে আছে এবং তার প্রবেশদ্বারের উপরে উৎকীর্ণ আছে:

R. C. Dutt, I. C. S, C. I. E.,
a distinguished man of letters lived in this house
from 1848—1872.

(বিশিষ্ট সাহিত্যিক আর. সি. দত্ত, আই. সি. এস., সি. আই. ই.,
এই বাড়ীতে ১৮৪৮ থেকে ১৮৭২ পর্য্যন্ত বাস করেছিলেন।)

তরুর পিতামহ রসময় দত্ত ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের একজন উৎসাহী পাঠক এবং অর্থতত্ত্ববিদ্। ব্রিটিশরা স্বভাবতঃই তাঁদের ভাষা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহকে খুবই সুনজরে দেখতেন এবং তাঁর এই অনুরাগ অন্য বাঙালীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কাজে তাঁকে উৎসাহিত করতেন। হিন্দু কলেজ কমিটির

অবৈতনিক সেক্রেটারির কাজ তাঁকে দেওয়া হয় এবং পরে তিনি স্মল কজেস কোর্টের একজন জজ ও কোর্ট্ অব রিকোয়েস্ট্‌স্‌-এর কমিশনারও হয়েছিলেন। রসময় সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন : 'তাঁর বাড়ীতে ইংরেজী বইয়ের একটি অতি চমৎকার সংগ্রহ ছিল এবং তিনি তাঁর পুত্রদের মনেও ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন।'' এই অনুরাগ তাঁর পৌত্রীদের মধ্যেও বর্তেছিল। যে ব্যয়বহুল পূজা-অনুষ্ঠানাদি তাঁর পিতা নীলমণিকে নিঃস্ব করেছিল তিনি সেগুলির বিরোধিতা করতেন। এজন্য গোঁড়া ব্রাহ্মণদের তিনি ছিলেন চক্ষুশূল। তরুর জন্মের দুই বৎসর আগে ১৮৫৪ সালের ১৪ মে তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বাইবেল পড়েছিলেন এবং এর প্রার্থনা সংগীতগুলিকে তিনি তাঁর পরিবারের মেয়েদের দিয়ে বাংলা করিয়ে লেখান ; এ-বিষয়ে তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন স্কটের কমেণ্টারি।

দত্ত পরিবারের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের বৃত্তান্তটি বেশ চিত্তাকর্ষক। ১৮৫৪ সালের ২৯ জুন তারিখে লেখা ডক্টর এস. ডব্‌লিউ. ম্যাকের একটি চিঠিতে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। রসময়ের মৃত্যু হলে তাঁর মৃতদেহ দাহ করার সময়ই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কিষেন অসুস্থ হয়ে পড়েন ও কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরও মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশ অগিল্‌ভি টেম্প্‌ল্ নামক একজন মিশনারিকে আসতে অনুরোধ করে পাঠান ; ডঃ ম্যাকে তখন অসুস্থ ছিলেন বলে নিজে গিরিশের বাড়ীতে যেতে পারেন নি, কিন্তু তিনি মিঃ ইউয়াটকে অগিল্‌ভি টেম্প্‌লের সঙ্গে গিয়ে গিরিশ এবং তাঁর ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে পাঠান। গিরিশ এই মিশনারিদের জানালেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিষেন মৃত্যুর পূর্বে পরলোকের একটি অলৌকিক দর্শন লাভ করেন ; তিনি খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পবিত্র জলের অভিষেক দ্বারা দীক্ষিত হবার ইচ্ছা তাঁর ছিল ; মুমূর্ষু মানুষটির শয্যাপার্শ্বে মিশনারিদের উপস্থিতি অনেকের মনঃপূত হবে না জেনে, গিরিশ স্বয়ং হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও পিতৃরূপী ঈশ্বর, পুত্ররূপী ঈশ্বর এবং পবিত্রাত্মারূপী ঈশ্বরের নামে কিষেনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদান করেন। অতঃপর কিষেন তাঁর পরিবারের সকলকে তাঁর শয্যাপার্শ্বে আহ্বান করে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তাঁর অন্তিমকালীন উপলব্ধির কথা তাঁদের জানিয়ে তাঁর পরিবারের সকলকেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পরামর্শ দেন।

ডঃ ম্যাকে লিখেছেন, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর অন্য ভ্রাতারা

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পক্ষে ও বিপক্ষে যে-সব যুক্তি আছে তা নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁদের পত্নীরা পরিবারের সকলে মিলে খ্রীষ্টান হওয়ার বিরোধিতা করেন কিন্তু নিজেরা স্বামীদের সঙ্গী হতে রাজী হন; ১৮৬২ সালে দত্তরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এ কাজে আট বৎসর বিলম্ব হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ বাড়ীর মেয়েদের আগ্রহের অভাব এবং হিন্দু সমাজের বিরোধিতা। গোবিন চন্দর বৃন্দাবন মিত্রের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে বিবাহ করেন। ক্ষেত্রমণি বাংলায় অনেক পড়াশোনা করেছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্র, পুরাণ ও লৌকিক উপাখ্যানগুলির সঙ্গে তাঁর খুবই পরিচয় ছিল। তাঁর শান্ত স্বভাব, তাঁর গান ও গল্প বলার সহজাত শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তরুর মনে ভারতবর্ষের প্রাচীন কাব্যগুলি সম্বন্ধে এমন গভীর অনুরাগের সঞ্চার হয়। তরুর ফরাসী সুহৃদ্ মাদ্‌মোআজেল ক্লারিস বাদে-কে তরু লিখেছিলেন, 'সন্ধ্যাবেলাগুলিতে যখন আমি আমার মায়ের কণ্ঠে আমার দেশের পুরনো দিনের গানগুলি শুনি তখন প্রায় সব সময়েই আমি চোখের জল ফেলি।'

যদিও ক্ষেত্রমণি তাঁর স্বামী গোবিন চন্দর এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ১৮৬২ সালে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং গোবিন চন্দরের অন্য ভ্রাতারা এবং ভ্রাতৃবধূরাও তাই করেছিলেন, তবু পরিবারের মেয়েদের হিন্দুধর্মে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণই ছিল; কেবল ক্ষেত্রমণি পরবর্তীকালে একজন গভীর আবেগপ্রবণ খ্রীষ্টান হয়ে উঠেছিলেন এবং গোবিন চন্দর, ক্ষেত্রমণি, তাঁদের পুত্রকন্যারা এবং পরিবারের অন্য সকলে গভীর বিশ্বাস ও নিষ্ঠা নিয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্মানুষ্ঠানগুলি পালন করতেন। অবশ্য মাঝে একবার গোবিনের কোনো কারণে ভয় হয়েছিল, হয়ত বা পত্নীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে; এই সময় তিনি যে একটি কবিতা রচনা করেন, তাতে তাঁর তখনকার মনের অবস্থা বোঝা যায়। এটি পরে 'ডাট্ ফ্যামিলি অ্যাল্‌বাম্'-এ ছাপা হয়েছিল। কবিতাটির প্রথম স্তবকটির অর্থ হল এই:

না, যেও না এভাবে ছেড়ে,
একটুখানি দাঁড়াও,
ঘৃণায় আমায় দিও না দূরে ঠেলে;
সবার মতো তুমিও শেষে
ফিরাবে কি গো মুখ,
যাবে কি চলে আমাকে একা ফেলে?

দেখব তোমায়—আমায় নিয়ে
ঐ যারা আজ হাসে,
ঐ উদাসীন, মমতাহীন
উদ্ধতদের পাশে,
অভিসম্পাত দিচ্ছে যারা
পুণ্য সে দিনটিরে,
সাহস করে 'চাইনে প্রতীক' বলে
যে-দিনটিতে বিনতজানু
হলেম আমি এসে,
পরিত্রাতার সিংহাসনের তলে ?

গোবিন চন্দরের সঙ্গে ক্ষেত্রমণির যখন বিবাহ হয় তখন ক্ষেত্রমণি ইংরেজী একেবারে জানতেন না বললেই চলে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ভাষা ব্যবহারে তাঁর এতটাই স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল যে তিনি 'দি ব্লাড অব জিজাস্' নামের একটি ইংরেজী বই বাংলায় তর্জমা করেন। 'দি ট্র্যাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটী অব ক্যালকাটা' থেকে তাঁর এই অনুবাদ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অল্পায়ু পরিবারের অন্য সকলের মৃত্যুর পরেও ক্ষেত্রমণি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং ভগবানের একজন সত্যকারের সাধ্বী উপাসিকা হয়ে উঠেছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

মেয়েদের উপর তাঁর স্বামীর যতখানি, ক্ষেত্রমণিরও প্রায় ততখানিই প্রভাব পড়েছিল। হরিহর দাসের কাছে দত্ত পরিবার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বিশপ ক্লিফর্ড মন্তব্য করেছেন, 'আমি দেখে শিখে এইটাই উপলব্ধি করলাম যে, তরু যদি তাঁর সহজাত প্রতিভার সম্পদ্ তাঁর পিতৃকুল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকেন ত তাঁর নীতিপরায়ণতার সৌন্দর্য্য এবং চারিত্রিক মাধুর্য্য তিনি খুব বেশি পরিমাণেই তাঁর মায়ের দিক্ থেকে পেয়েছিলেন।'[৮]

গোবিন চন্দর ছিলেন উদারচেতা দরদী মানুষ; কারও সম্বন্ধে অকারণ বিরূপতা বা পরমত-অসহিষ্ণুতা তাঁর স্বভাব-বহির্ভূত ছিল। রসময়ের পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৩৬ সালে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। প্রোফেসার ডেভিড লেস্টার রিচার্ড্সনের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য বলে তিনি বিবেচিত হতেন। পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এসে এই

লোভনীয় স্থানটি দখল করে নেন। গোবিন নাট্যাভিনয়েও যোগ দিতেন এবং তাঁর প্রোফেসারের কাছে শেক্‌স্‌পীয়ার থেকে আবৃত্তি করতে শিখেছিলেন। তাঁর উপর খুব শুভ প্রভাব পড়েছিল তাঁর এই প্রোফেসারের। সকলের ভালোবাসার পাত্র প্রোফেসার রিচার্ড্‌সনের অন্য প্রিয়শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং ভোলানাথ চন্দর। বস্তুতঃ এই সময়কার লেখক ও চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে বহুখ্যাত একদল মানুষ ছিলেন হিন্দু কলেজের পূর্বতন ছাত্র।

গোবিন চন্দর অল্প বয়স থেকেই খেয়াল খুশি মতন কিছু কিছু লিখতেন। এবং তাঁর একটি ছোট কবিতার বইয়ের প্রশংসা ছাপা হয়েছিল ব্ল্যাক্‌উড্‌স্ ম্যাগাজিনে। ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা ক্যালকাটা রিভিউএও কবিতাগুলির প্রশংসা বেরিয়েছিল। এগুলি পরে অন্যদের কবিতার সঙ্গে ডি. এফ. এ -র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

শিক্ষা সমাপ্ত করে গোবিন চন্দর সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন এবং ক্রমোন্নতির ফলে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ কণ্ট্রোলার অব অ্যাকাউণ্ট্‌স্ হন। বাঙালীরা উপেক্ষিত হচ্ছে, কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এইরকম একটি অসঙ্গত উক্তি করার ফলে তাঁকে বোম্বাইয়ে বদ্‌লি করা হয়। সপরিবারে সেখানে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন। কারণ তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হয়নি ; স্পষ্টতঃই তাঁর পূর্বেকার সেই প্রতিবাদসূচক উক্তির জন্যে কতকটা যেন তাঁকে অবহেলা করা হয়েছিল। এখন তাঁর সমস্ত সময় সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে নিয়োজিত করার পথে কোনো বাধা রইল না এবং যেহেতু তাঁদের অর্থসঙ্গতি প্রচুর ছিল, চাকরি না থাকাটাকে খুব একটা ভাবনার বিষয় বলেও তাঁর মনে হল না।

১৮৭৩ সালে গোবিন সপরিবারে ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার পরে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন : 'আমার সঙ্গে তাঁদের ব্যবহারে বরাবরের মতোই সহৃদয়তা, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্যের পরিচয় পেতাম এবং ধর্মানুরাগে তাঁদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। কিন্তু যে মারাত্মক ব্যাধির বীজ এঁরা ইংলণ্ড থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন সেটা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রকট হতে লাগল। প্রথমে তাঁর দিদি অরু, এবং তারপর প্রতিভাশালিনী তরু স্বয়ং এই রোগের কবলে পড়ে প্রাণ হারালেন। তরুর কবিতা ইংলণ্ডে এড্‌মণ্ড্ গস্‌-এর প্রশংসা লাভ

করেছিল এবং বিশিষ্ট শ্রেণীর পাঠকদের একটি দল তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। যদি পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনি বাঁচতেন ত তাঁর পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে নাম রেখে যাওয়া হয়ত সম্ভব হত। কন্যাদের মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসর পর গোবিন চন্দর ইহলোক ত্যাগ করেন এবং আরও কয়েক বৎসর পরে তার পত্নী তাঁর অনুগমন করেন।'

বালিকা বয়সে

কলকাতার মাঝামাঝি অঞ্চলে রামবাগানে, ১২ মাণিকতলা স্ট্রীটে পিতৃগৃহে তরুর জন্ম হয়। গোবিন চন্দরের তিনটি সন্তান ছিল। পুত্র অব্জুর জন্ম ১৮৫১ সালের ১৮ই অক্টোবর, মৃত্যু ৭ জুলাই ১৮৬৫; কন্যা অরু, জন্ম ১৮৫৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ২৩শে জুলাই ১৮৭৪; এবং সর্বকনিষ্ঠা তরু, জন্ম ১৮৫৬ সালের ৪ঠা মার্চ, মৃত্যু ৩০শে অগস্ট ১৮৭৭।

১৮৬২ সালে, কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে ক্রাইস্ট্ চার্চে, সন্তানদের নিয়ে দত্ত পরিবার খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ঘটবার পর একদিন দুই বোন যখন খেলা করছিলেন তখন অরু হঠাৎ তরুকে বললেন, 'তুমি ত খ্রীষ্টান, তাই না? বাইবেলে আছে, কেউ যদি তোমার এক গালে চড় মারে ত তার দিকে অন্য গালটিকেও ঘুরিয়ে দেবে। আচ্ছা, ধর, এখন কেউ যদি তোমার এক গালে একটি চড় মারে, তুমি কি পারবে তার দিকে তোমার অন্য গালটি ঘুরিয়ে দিতে?'

তরু বললেন, 'হ্যাঁ, পারব', এবং অত্যন্ত অবাক্ হলেন যখন অরু তাঁর এক গালে সশব্দে একটি চপেটাঘাত করলেন। তরুর কান্না বাধা মানল না, কিন্তু তিনি শোধ তুলবার কোনো চেষ্টা করলেন না। অবশ্য অন্য গালটি আর-একটি চপেটাঘাতের জন্যে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন কি না সেবিষয়ে তাঁর জীবনী-লেখক হরিহর দাস নির্বাক্। তরু ছিলেন তেজী স্বভাবের মেয়ে এবং বয়সে ছোট হলেও অরু তাঁরই কথা শুনে চলতেন। তাই মনে হয় যে ঐ বালিকা বয়সে অরুর চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল বেশি।

এই তিনটি বালক-বালিকার অতি অল্প বয়স থেকেই লেখাপড়া শেখার কাজে প্রচুর পরিশ্রম করতে হত। শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন নিষ্ঠাবান্ বয়স্ক খ্রীষ্টান ভদ্রলোক এঁদের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এঁরই একজন অতি নিকট আত্মীয়া ছিলেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউ. সি. বনার্জির পত্নী। শিবচন্দ্রকে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্তই ভালোবাসতেন। ১৮৭৭ সালে মিস্ মার্টিনকে একটি চিঠিতে তরু লিখেছিলেন, 'আমরা যখন খুবই ছোট তখন থেকেই উনি আমাদের

ইংরেজী শেখাতেন। সেই শিশুবয়সে আমরা খুবই ভালোবাসতাম তাঁকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই ভালোবাসা আরও গভীর হয় এবং তার সঙ্গে শ্রদ্ধা এসে মেশে।…তিনি এমন সত্যিকারের একজন খ্রীষ্টধর্মানুরক্ত মানুষ এবং এমন আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের সমস্ত সুখদুঃখের ভাগ নিতেন। আমরা কত চেষ্টা করেছি, বক্‌বক্‌ করে, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে পড়ার সময় নষ্ট করতে, কিন্তু তিনি আমাদের গল্পগুজবের জন্যে বেশি সময় দিতেন না। মনে আছে, আমরা একজনের পর একজন তাঁকে অর্থদপ্তরের প্রত্যেকটি কর্মচারীর স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশ্ন করতাম। মিঃ অমুকের কার্য্যকলাপ স্বাস্থ্য এবং বিষয়আশয় নিয়ে আমরা কত না কৌতূহলী এবং উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠতাম। শেষের দিকে আমরা তাঁর কাছে মিল্‌টন পড়তাম। প্যারাডাইস্‌ লস্ট্‌ আমরা বারবার পড়েছি। এতবার পড়েছি যে ফার্স্ট্‌ বুকটি সম্পূর্ণ এবং সেকেণ্ড্‌ বুকটির একাংশ আমাদের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।'

কিছুদিনের মধ্যে তরু এবং অরু দুজনেই মিসেস্‌ সিনাক্‌স্‌ নাম্নী একজন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর কাছে পিয়ানো বাজানো এবং গান শেখা আরম্ভ করেন। তাঁদের এদিককার স্বাভাবিক প্রবণতা ইউরোপে যাবার পর আরও বিকশিত হয়েছিল এবং দুবোনই পিয়ানো বাজানোতে এবং নীচু গ্রামের গভীর কণ্ঠস্বরের গানে অনেকের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ইউরোপীয় এবং বাংলা রীতির গান-বাজনা, একটি বাগানবাড়ী এবং কলকাতায় তাঁদের পৈতৃক-বাসভবন, বহুসংখ্যক আত্মীয়বন্ধু, ব্যাপক অধ্যয়নের সুযোগ, এ সমস্ত নিয়ে তরুর বাল্যকাল খুবই সুখের হতে পারত, কিন্তু ১৮৬৫ সালে অব্‌জুর অকালমৃত্যুর দরুণ তা হতে পারল না। রমেশচন্দ্রের রচনায় তাঁর এই খুড়তুত ভাইবোনদের এবং বাগমারির বাগানবাড়ীর একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন: 'অনেক একর জমি নিয়ে বহু ফলগাছের ছায়ায় ঢাকা বাগানটি ছিল প্রকাণ্ড। একটা খালের উপরকার গ্রাম্য ধরনের একটি সাঁকো আমাদের বাল্যকালে একটি মহা আনন্দদায়ক জিনিস ছিল। বাগানের সর্বত্র ছিল আমাদের অবাধগতি, এবং গোবিন চন্দরের একমাত্র ছেলে অব্‌জু তার অনেক পেয়ারের গোপন জায়গা আমাদের দেখিয়ে নিয়ে বেড়াত। বেচারার খুব অল্প বয়সে মৃত্যু হয় এবং তাকে হারানোর দুঃখ তার পিতামাতা কখনোই ভুলতে পারেন নি। ফলগাছের সেই অরণ্যের মাঝখানে বেশ আরামে থাকা যায়

এমন অনেকখানি জায়গা নিয়ে তৈরি একতলা বাগানবাড়ীটি—এটি ছিল যেন প্রশান্তির একটি নিখুঁত ছবি। বাড়ীটিতে বাছাই করা বইয়ের একটি ভালো সংগ্রহ ছিল, কারণ গোবিন চন্দরের চিত্তবিনোদনের একমাত্র উপায় ছিল অধ্যয়ন।'[১]

এই ঘনিষ্ঠ পারিবারিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ কোনো কিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু সে অতি অল্প সময়ের জন্যে। দেখতে দেখতে পরিবারটির উপর মৃত্যুর কালোছায়া ঘনিয়ে এল।

প্রথমে অব্জু। তার অকালমৃত্যুর পর গোবিনের মনে সারাক্ষণ এই ভয় জেগে থাকত, তাঁর অন্য দুটি সন্তানকেও এইভাবেই তিনি হারাবেন। এজন্যে তিনি তাদের কখনো চোখের আড়াল হতে দিতেন না এবং তাদের সঙ্গে যে সময়টা তিনি কাটাতেন তার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল তাঁর কাছে মূল্যবান্। চোদ্দ বৎসর বয়সে অব্জুর মৃত্যুর পর গোবিন একটি সনেট রচনা করেছিলেন। 'ডাট্ ফ্যামিলি অ্যাল্বাম্' প্রকাশিত হবার পর ইংলণ্ডে প্রায়ই তিনি রমেশচন্দ্রকে এটি পড়ে শোনাতেন। মর্মস্পর্শী ছত্রগুলি তিনি ক্রন্দনের সুরে পড়তেন—

গভীর-বেদনা-বিধুর হৃদয়ে
একা আমি নির্জনে.
ক্লান্ত এ মন অবসাদ ভরা
দিনগুলি শুধু গোনে।

কিন্তু তাঁর ধর্মবিশ্বাস, যা পরে তাঁকে এবং তাঁর পত্নীকে দুঃখবহনের এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা জুগিয়েছিল. শুরুতেই তা এইভাবে ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর প্রথম সন্তানটির মৃত্যুর পর :

প্রেমের মরণ নাই, জানে না বিচ্ছেদ কারে বলে.
সময় নিকট, উষা হেসে দেখা দেবে পূর্বাচলে।
সভয় সম্ভ্রমে আমি স্থান নেব সিংহাসনতলে,
আমি ভালোবাসি যারে সেও রবে পাশে।
মুক্ত আত্মা যত মহাকাশে
প্রশস্তি প্রার্থনা-গীতি সকলে শোনাবে উচ্চভাষে।

এই একই ধর্মনির্ভরতা তরুকেও নানা শোকদুঃখের মধ্যে সহশক্তি এনে দিয়েছে এবং এই আশা তাঁর সমস্ত রচনাকে গাঢ়ভাবে রঞ্জিত করেছে যে, এই

পৃথিবীর ক্লান্তিকর দিনগুলির অবসানের পর চির আনন্দময় পরলোক একটি আছে।

গোবিন স্বয়ং তাঁর তিনটি ছেলেমেয়ের শৈশবের চমৎকার একটি বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

সবার চেয়ে স্নেহপ্রবণ সবার বড় যেটি
ভালোবাসি সবার বেশি তাকে,
নেহাৎ কচি ছেলে, দেখায় প্রায় বড়দের মতন,
বহুকাল সে এমনি যেন থাকে।
করতে আমি চাইনে অহঙ্কার,
এর চেয়েও দীর্ঘ দেহ, নিষ্পাপ মন এত,
এই বয়সে কোথায় আছে কার।
পরেরটি ঘর আলো-করা, নম্র বড় স্বভাব,
ভায়ের চেয়ে হয়তো কিছু কম
ভালোবাসার গভীরতা, অথচ তাই বলে
ভায়ের মতো নয় কো সে দুর্দম।
কপালে আর গালদুটিতে লাজুক লালের আভা,
শান্ত অকলঙ্ক কোমলতায়
মনে হয় সে যেন সাঁঝের প্রথম তারার মতো।
এবার আসি সব ছোটটির কথায়।
একটি ছোট দুষ্টু পরী, মাথায় চুলের রাশ
অষ্টপ্রহর অগোছালোই থাকে,
একসাথে একরোখা লাজুক : যতই তাকে ডাকি
কিছুতেই সে দেয় না সাড়া ডাকে।
হয়তো তখন বেরালছানা, কিংবা পাখি নিয়ে
শোনায় সে তার আদরভরা ভাষা ;
কিন্তু বড়ই বুদ্ধিমতী। ন্যস্ত ধনের মতো
এদের পেয়ে বেঁধেছি এই বাসা।

১৮৬৯ সালে ইউরোপ যাওয়ার আগে শীতকালের প্রায় সবটাই তরু এবং পরিবারের অন্যান্যরা কলকাতাতেই কখনো বা রামবাগানে, কখনো বা

বেলগাছিয়ার কাছে বাগমারিতে কাটিয়েছিলেন। তরু বিশেষ করে তাঁদের বাগানবাড়ীটিকে ভালোবাসতেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর অনেক কবিতায় এই বাগানটির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। মাথায় উঁচু জাঁকালো চেহারার গাছগুলি ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়।

সৌন্দর্য্যের কি মহিমা এ গাছগুলিতে।
একা একভিতে
আছে শাল,
গম্ভীর বিশাল,
নয়নের ক্লান্তিহর। আছে সারি সারি
ঋজু দীর্ঘ দেহ নিয়ে সুঠাম সুপারি.
লঘুভার শীর্ষচ্ছদ সবুজ শাখার।
তেঁতুলের বিরাট্ আকার
প্রসারিত ডালপালা, হাল্কা পাতার
ঝাঁক নিয়ে। তিক্ত নিম, মৃদুগন্ধী, তার
ফিকে-রঙা পাতা। আর শিমুলের কী জাঁকজমক
সুন্দরী বধূর মতো! ফুলে ফুলে চুনির চমক!
ডুমুরের বিরাট শিবির
ছায়া-সুনিবিড়,
শীতল আশ্রয়ে যার স্থান হতে পারে বিশ্রামের
এক সেনাবাহিনীর। পল্লবদামের
মাঝে মাঝে আছে ফাঁক, দেখাবারে শুধু মনোলোভা
বাহিরে পশ্চিমাকাশে সূর্য্যাস্তের শোভা।
দখিনা বাতাসে দোল খায়
বাঁশগুলি, বুলবুলি দোলে বসে তাদেরই শাখায়।
আমবাগানের ঘোর অন্ধকার, গাছে গাছে ঠাসা,
কলকোলাহলকারী কাকেদের বাসা।
চাঁপাফুল বকফুল গাছেদের সার,
প্রশান্তসাগরদ্বীপী ঝাউ পাশে তার।

নাগকেশরের গাছে ঝুলে থাকে ফুল
সুন্দরীকুলের যেন দু-কানের দুল।
আরণ্য আঙুরলতা সবার উপর
বেয়ে বেয়ে ওঠে আর গড়ে লতাঘর।
সংস্কৃত ভাষার কবিকুলে
শিরীষের বহুখ্যাতি, যে গাছের ফুলে
গ্রামের নারীরা রঙ্গভরে
অঙ্গসজ্জা করে।
মহাবল দৈত্যবৎ
কোথাও অশথ।
কোথাও বা শিরে জটাভার
ছোটো ছোটো কাঁটা ঝোপ-ঝাড়।
এমনই হাজার গাছ চারিদিক্ ঘিরে,
কারো লাল শিরস্ত্রাণ, সোনার মুকুট কারো শিরে,
সবুজের তাজ কারো। হত তারা তরুণের চোখে
উদ্ভাসিত গোধূলির ছায়াছায়া পিঙ্গল আলোকে।

ভারতবর্ষের সুন্দর গাছগুলিকে যে বহুক্ষণ ধরে পর্য্যবেক্ষণ করেছে এবং ভালোবেসেছে সে ছাড়া আর কারো পক্ষে সেগুলির এমন নিখুঁত সুন্দর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হত না। তরুর বিখ্যাত কবিতা 'আওয়ার ক্যাজিওয়ারিনা ট্রি'-তেও আমরা গাছেদের সঙ্গে তাঁর একটা অতীন্দ্রিয়, প্রায় আত্মিক যোগের আভাস পাই।

বাগমারি নিয়ে লেখা তাঁর সনেটটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম। এটি পাঠ করার সময় তাঁদের বাড়ীর চারদিক্‌কার বিস্তীর্ণ বাগানে অরু-তরুদের সঙ্গে তাঁদের নানা দিক্ দিয়ে সম্পর্কিত বহু ভাইবোন এবং অল্পবয়সী বন্ধুদের ক্রীড়াকৌতুক যেন আমরা কল্পনার চোখে দেখতে পাই।

আমাদের বাগানটি ঘিরে আছে সবুজ পাথার
নানাজাতি গাছের পাতার।
সে সবুজ প্রভাহীন অবিচিত্র নয়;
আছে ভেদাভেদ আর অনেক বর্ণের সমন্বয়।

হাল্‌কা সবুজ আছে তেঁতুলের এধারে ওধারে,
গাঢ় সবুজের দ্যুতি আছে আম্রপল্লবের ঝাড়ে।
তাল নারিকেল আর খেজুর সুপারি হেথা হোথা
মিলায় এদের রঙে সুদীর্ঘ দেহের ধূসরতা।
শিমুল পড়েছে নুয়ে নিস্তরঙ্গ দীঘির উপরে,
সেখানে অনেক লাল, শুধু লালে লাল থরে থরে।
সে-ফুলের রাশি চোখে লোহিত বরণে
চমক লাগায় ভেরীধ্বনির ধরনে।
কিন্তু পূবদিকে আছে যেই বাঁশঝাড়
মনোরম তার চেয়ে কিছু নাই আর।
ফাঁকে ফাঁকে যে সময় চাঁদ দেয় ধরা
শ্বেতপদ্ম হয়ে যায় পানপাত্র রূপো দিয়ে গড়া।
চাও ত মাতাল হও সেই রূপসুধা করে পান,
নয় শুধু চেয়ে দেখ আদিম কালের স্বর্গোদ্যান।[১১]

বাগমারির বাগানবাড়ী প্রথম থেকেই তরুর পাঠকগোষ্ঠীর মনে প্রচুর কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল, যেজন্যে তরুর অকাল মৃত্যুর পর বিদেশ থেকে অনেকে এসে এই বাগান দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মিস এলিজাবেথ এস্. কটন ছিলেন তরুর একজন ভক্ত। ইনি তরুর মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পর, ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় আসেন এবং একটি চিঠিতে হরিহর দাসকে লেখেন :

"প্রিয় মহাশয়,

বহু বৎসর যাবৎ আমি কলকাতাকে, সহজাত প্রতিভার অধিকারিণী তরু দত্তের স্মৃতির দ্বারা পবিত্রীকৃত একটি স্থান বলে মনে করে এসেছি। এবং আমি এসেছি, যদি সম্ভব হয় তাঁর বাড়ীটি দেখতে, যেখানে বাস করে তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভার অল্পসংখ্যক বহুমূল্যবান্ কয়েকটি ফল পৃথিবীর মানুষের জন্যে রেখে গিয়েছেন, যারা তাঁর জন্যে শোক করেই চলেছে।

সেই বাগানবাড়ীটি দেখতে পেলে আমি খুশি হই, যেখানে মিঃ এডমণ্ড্ গস্-এর ভাষায়, তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের গূঢ়মর্মের গভীরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন।"[১২]

যে দেশে তরুর জন্ম সেখানকার কবিত্বময় প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁর যে বাল্যকালের শুরু, তার পরিণতি অপেক্ষা করছিল তাঁর বিদেশ বাসের জন্যে। তাঁর সন্তানদের বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেবেন এ বিষয়ে গোবিন চন্দর মনস্থির করে ফেলেছিলেন, যার ফলে তরু এবং তাঁর দিদি অরু এই দুজন, বাঙালী মেয়েদের মধ্যে প্রথম 'কালাপানি' পার হলেন। তাঁদের মিশনারি বন্ধু মেরী বার্টন লিখেছেন, 'তাঁদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি কন্যাদুটিকে সম্ভবপর সর্বোত্তম শিক্ষা দেবেন এবিষয়ে তাঁরা (তরু-অরুর পিতামাতা) ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা সেই শীতকালে (১৮৬৯) দেশে ফিরছিলাম বলে তাঁরা ইউরোপে আসার জন্যে আমাদের সঙ্গী রূপে পাবার সুযোগ গ্রহণ করলেন। আমার স্বামীর পরামর্শে তাঁরা প্রথম আমাদের সঙ্গে নিস্-এ এলেন। আমাদের মাতাপিতা তখন সেখানে থাকতেন এবং আমার যতদূর মনে পড়ে, দত্তরা সেখানে তিন-চার মাস কাটিয়েছিলেন। আমরা নিস্-এর অধিবাসী অনেকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করে দিয়েছিলাম, এবং তাঁরা সকলেই অল্পদিনের মধ্যে ফরাসী ভাষা শিখে নিয়েছিলেন।'[১৩]

তরু এবং অরু ছিলেন ফ্রান্সের দুজন ভক্ত পূজারিণী। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁদের যে ভালোবাসা তাঁর পরেই ছিল ফ্রান্স তাঁদের সবচেয়ে বেশি প্রেরণার উৎস। পরবর্তীকালে ফরাসীরা তরুকে ফরাসী নারী বলে দাবী করেছেন। ফরাসীদেশে মাত্র তের বৎসর বয়সে পদার্পণ করার ফলে আশ্চর্য আয়াসহীন ক্ষিপ্রতায় তিনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং সমস্ত জীবনই তিনি ফরাসী রোমান্টিক সাহিত্যে নিমগ্ন থেকে গভীরভাবে তার রস উপভোগ করেছেন আর ফ্রান্সকেও গভীরভাবেই ভালোবেসেছেন।

ফ্রান্স

দত্তরা মার্সেইলে নেমে চলে গেলেন নিস্‌-এ। ১৮৭০ সালের বসন্তকাল অবধি সেখানেই কাটালেন। তরু আর অরু একটি পাঁসিওন্না বা প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি হলেন ও খুব মন দিয়ে ফরাসী ভাষা শিখতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সে-ভাষা তাঁদের বেশ সড়গড় হয়ে গেল। দুই বোন ছাত্রী হিসাবে এই একটি মাত্র স্কুলেই যোগ দিয়েছিলেন। মাদাম শোআইয়ে নাম্নী যে গৃহশিক্ষিকাটির কাছে গোবিন চন্দর ফরাসী ভাষা শিখতেন, তাঁর কাছে আরও বেশি নিষ্ঠা নিয়ে ভাষাটি শিখতে পারবেন ভেবে তরুরা ঐ স্কুলটি ছেড়ে দেন। এরপর একটা সময় আসতে দেরি হল না যখন দু বোন ফরাসী সাহিত্যের মধ্যে নিজেদের একেবারে নিমজ্জিত করে দিলেন। ফরাসী বিপ্লবও তরুর মনকে মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। স্বাধীনতার অনুপ্রেরণায় তখনকার দিনের ফরাসী সাহিত্য ছিল ওতপ্রোত। নানারকম সামাজিক নিগ্রহ থেকে নারী-জাতির মুক্তির দাবী নিয়ে সোচ্চার জর্জ সাঁদ্‌-এর উপন্যাসগুলি ছিল ভারতবর্ষীয়দের খুবই আদরের জিনিস। ফ্রান্সকে তরু এত বেশি ভালোবাসতেন যে, এক সময় তিনি ফরাসী বালিকা বলে পরিগণিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন. তিনি একজন অদম্য, সঙ্কল্পে অটল ফরাসী নারী।

নিস্‌-এ তাঁরা ছিলেন ওতেল এল্‌ভেতিক্‌-এ। সেখান থেকে তরু তাঁর পিতৃব্যপুত্র অরুণকে লিখেছিলেন, 'চিঠিটি যখন এল, তখন আমরা ত্যাব্‌ল্‌ দোত্‌-এ (এক ধরনের রেস্তর াঁয়) বসে খাচ্ছিলাম। ঘরের মধ্যে দুজন বাদ্যকর হার্প্‌ এবং বেহালা বাজাচ্ছিলেন আমাদের ক্ষিদেটাকে চাঙ্গা করে তুলতে। ফরাসীদের এইটাই নিয়ম। আমরা এখানকার কার্নিভাল দেখতে গিয়েছিলাম। এতে যারা যোগ দেয়, তার গায়ে রং মেখে, মুখোস পরে সবাইকার দিকে বঁবঁ (চিনির মিষ্টি) ছুঁড়ে মারে আর লেণ্ট্‌এর আগে আহ্লাদে মজা করে নেয়। এর কারণ, এরা ক্যাথলিক বলে লেণ্ট্‌-এর সময়টা খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে এদের নিয়মের খুব কড়াকড়ির মধ্যে থাকতে হয়, তাই লেণ্ট্‌ শুরু হবার আগের সময়টা এরা চুটিয়ে ফুর্তি করে নেবার চেষ্টা করে।'

কার্নিভাল দেখতে কর্দমাক্ত পথে হেঁটে গিয়েছিলেন বলে তাঁদের পরনের কাপড়ে কাদার দাগ লেগে গিয়েছিল, তাই তাঁরা একটি গাড়ি ভাড়া করলেন, কিন্তু তাতেও কিছু সুরাহা হল না। অবশ্য কলকাতার ছ্যাকড়া গাড়ির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল বলে তাঁদের মনে হয়েছিল, 'এখানকার ভাড়াগাড়িগুলির কোনোটাই কলকাতার সবচেয়ে ভালো গাড়িগুলির চেয়ে খারাপ নয়।' মা-বাবাকে গাড়িতে রেখে মেয়েরা নেমে এগিয়ে গেলেন মিসেস বার্টনের ভাই, পঞ্জাবের একজন আই. সি. এস্. অফিসার, মিস্টার এলিয়ট-এর সঙ্গে একটি খোলা চত্বরের দিকে। সেখানে চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা তাঁরা ভালোই দেখতে পেলেন।

ফ্রান্সে তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ছিলেন একজন চিকিৎসকের পত্নী। তিনি তাঁদের ভালোও বাসতেন খুব এবং খুব চাইতেন যে তাঁরা ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শিখুন। তিনি তাঁদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতেই চাইতেন না, যাতে বাধ্য হয়ে ফরাসী বলতে তাঁরা কতকটা অভ্যস্ত হন। তাঁদের ভুলচুক যতই হোক না কেন, এই চিকিৎসকপত্নী সর্বদাই বলতেন—'ত্রে বিয়ঁ!'—খুব ভালো!

সেই সময়টায় ইংলণ্ডের চেয়েও ফ্রান্সের কাছে পাবার মতো জিনিস ছিল ঢের বেশি। তরু ফরাসীদের জীবনযাত্রা খুব মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং ফরাসী মেয়েদের চরিত্র নিশ্চয় তাঁর মনে খুব দাগ কেটেছিল, কারণ, একটি ফরাসী মেয়েকে নিয়ে পরে তিনি একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। অনেকটা তখনকার দিনে ভারতীয় অপেক্ষাকৃত আধুনিকাদের ধরনেই রক্ষণশীল পরিবারের ফরাসী মেয়েদের মানুষ করা হত। 'ল্য জুর্নাল দ্য মাদ্‌মোআজেল দার্‌ভেয়্‌র্' নামক তাঁর উপন্যাসটিতে মার্‌গ্যেরিত্‌-এর চরিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। হয়ত নিস্‌-এ তিনি যে ফরাসী মেয়েদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের আদল সামনে রেখেই এই মেয়েটির চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। অন্যদিকে আবার মেয়েটিকে অনায়াসেই তরুর সঙ্গেও অভিন্ন বলে ভাবা যেতে পারে। তিনি যে তাঁর গল্পের জন্যে ফরাসী বিষয়বস্তু এবং ফরাসী নায়িকা মনোনীত করেছিলেন এতে প্রমাণ হয় যে, ফরাসী দেশে এবং সে-দেশের সংসারযাত্রার মধ্যে নিজেকে বহিরাগতের মতো বলে তিনি মনে করতেন না, যদিও তাঁর গল্পের পটভূমি তিনি স্থাপন করেছিলেন ইংলণ্ডে। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে

তরুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় মিঃ ডার্‌ম্‌স্টেটর-কে অত্যন্তই মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন ‘ফ্রান্সে তাঁদের স্বল্পকালের যে বসবাস তরুর চিন্তাধারা এবং কল্পনাবৃত্তিকে এমন বিস্ময়কর ভাবে প্রভাবিত করেছিল তার আরও বিশদ বিবরণ জানতে মানুষের ইচ্ছা করে। ফরাসী হয়ে উঠেছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ভাষা এবং ফ্রান্স তাঁর স্বেচ্ছায় বরণ করা দেশ।’[১৪]

নিস্‌-এ থাকতে দত্তরা প্রম্‌নাদ্‌ আংলেতে হেঁটে বেড়াতেন এবং ভূমধ্য সাগর ও তার তীরবর্তী স্থানগুলির বর্ণাঢ্য শোভা দেখতে ভালোবাসতেন। নীলবর্ণ সমুদ্র, উজ্জ্বলবর্ণের বুগেনভিলিয়া এবং নানা জাতি ফুল, পাহাড়ের ঢালু গায়ে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া জমিতে সদ্য রং করা লাল টালির ছাতওয়ালা বাগানবাড়ীগুলি, আঙুর লতার ক্ষেত, ফলের বাগান, পায়ে হেঁটে বেড়াবার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী রাস্তা, এই সমস্ত কিছুর সৌন্দর্য্য দুটি বালিকার কবিচিত্তকে কি প্রকার হর্ষাপ্লুত করে তুলত তা কল্পনা করে বুঝতে পারা যায়। কান্‌ এবং মনাকো দেখতে তাঁরা গিয়েছিলেন আমরা জানি। এই অঞ্চলে তাঁদের পর্য্যটন নিশ্চয়ই খুব উপভোগ্য হয়েছিল, এবং ফরাসী জীবনধারা ও সংস্কৃতির মনোহারিতায় তাঁরা গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তরুর চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের অরুর দক্ষিণ ফ্রান্সের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুও সহ্য হল না। তাঁর অসুখ করল, অসুখ সারল, আবার তিনি অসুখে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যেই এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে দত্তদের ফ্রান্স ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু যে অল্প ক’মাস তাঁরা সেদেশে ছিলেন তার প্রভাব তাঁদের মেয়েদের মনে থেকে গেল বললে খুব কম করে বলা হয়।

গোবিন তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে পারি হয়ে ইংলণ্ডে যাবেন স্থির করলেন। অবশ্য কেন যে তিনি আশা করেছিলেন সেখানকার আরও বেশি ঠাণ্ডা, কুয়াশাচ্ছন্ন এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া অরুর স্বাস্থ্যের অনুকূল হবে সেটা বোঝা শক্ত। ১৮৭০ সালের বসন্তকালে তাঁদের পুরাতন বন্ধু মিসেস বার্টনের সঙ্গে তাঁরা ইংলণ্ডে চলে আসেন।

তরু এবং অরু সম্বন্ধে মিসেস্‌ বার্টন লিখেছেন, “ইতিহাস, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও অন্যান্য চারুকলা বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান ছিল অসাধারণ আর এর সবটাই তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের পিতার কাছ থেকে। মনে আছে আমরা নিস্‌-এ তাঁদের ক্যানন চাইল্‌ডারের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলাম, চলে আসার

আগে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। টেবিলের উপর ব্রন্জের বেশ বড় একটি মূর্তি রাখা ছিল ডাইং গ্ল্যাডিয়েটার-এর। মিস্টার বার্টন কিংবা তরু-অরুদের পিতা সেটির গায়ে হাত রেখে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কে তা জান?' একটুও দেরি না করে দুবোন একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'এ ত ডাইং গ্ল্যাডিয়েটার।' আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ তাঁরা ত রোমে কখনো যাননি, কাজেই এই জ্ঞান বই থেকে লাভ করেছেন।"[১৫]

পারি গোবিনকে এত বেশি মুগ্ধ করেছিল যে তিনি 'পৃথিবীর এই রাজধানীতে' থেকে যাবেন স্থির করলেন। কারণ, 'যে যাই বলুক, সৌন্দর্য্য, আরাম-বিরামের সুব্যবস্থা, ভালো আবহাওয়া, পরিচ্ছন্নতা, এসব দিক্ দিয়ে বিচার করলে পারি নিশ্চয়ই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শহর।' কিন্তু পারিতে বেশিদিন থাকা তাঁদের অবশ্য হয়ে ওঠেনি। যদিও হরিহর দাস লিখেছেন, 'দীর্ঘকাল'। সব মিলিয়ে তাঁরা কম-বেশি চার মাস ফ্রান্সে ছিলেন, আর এই ক'মাসেরও বেশির ভাগ তাঁরা কাটিয়েছিলেন নিস্-এ।

ফ্রান্স ছেড়ে তাঁরা বুলন হয়ে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। বুলন থেকে ফোক্স্টোন যেতে চ্যানেল পার হওয়া নিয়ে গোবিনের একটি সুন্দর নিবন্ধ বেঙ্গল ম্যাগাজিনের ১৮৭৪ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে পি-এণ্ড্-ও-র জাহাজে মার্সেইল যাওয়ার সঙ্গে এর তুলনা করে গোবিন লিখেছেন, সারাপথ তাঁদের এত সেবা যত্ন করা হয়েছিল আর খাওয়ানো হয়েছিল 'যেন তিনি মোগল-সম্রাট্ অথবা মিশরের রাজপ্রতিনিধি,' কিন্তু চ্যানেল পার হওয়ার সময়টা সেবারেও খুবই অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কেটেছিল। বুলন তাঁদের ভালো লাগেনি, যদিও গোবিনের ধারণা ছিল, এটি একটি থেকে যাবার মতো জায়গা হবে, কারণ শহরটি খুব মজার বলে থ্যাকারের লেখায় এর বর্ণনা আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, 'এটি সমুদ্রের ধারের একটি বাজে শহর, এবং এর বাড়ীগুলি যে কেবল জাহাজের খালাসীদের জন্যেই তৈরি, সেটা দেখলেই বোঝা যায়।' এদিকে কুয়াশা নেই, দিনগুলি রোদে ঝলমল, তাই তাঁরা বুলন্-এ দেরি না করে চ্যানেল পার হবেন স্থির করলেন। ফোক্স্টোনেও সময় নষ্ট না করে তাঁরা লণ্ডনের ট্রেন ধরলেন।

দত্তরা যদিও ফ্রান্সে কয়েক মাস মাত্র ছিলেন, দেশটির প্রতি তরুর ভালোবাসা কিন্তু তার ভাষা-সাহিত্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরক্তির মধ্যেই

সীমাবদ্ধ ছিল না। এ-বিষয় পরে মাদ্‌মোআজেল্‌ ক্লারিস্‌ বাদে যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্মরণ করা যেতে পারে: 'তিনি যে আমাদের দেশকে ভালোবাসতেন ফ্রান্সের বড় দুঃখের দিনে তার পরিচয় দিয়েছেন' ফ্রান্স-প্রাশিয়া যুদ্ধের সময় তাঁর সহানুভূতি দেখিয়ে। তরুর বয়স তখন সবেমাত্র চোদ্দ কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের প্রতি ঐ বয়সেই তাঁর সক্রিয় অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল। বিস্‌মার্কের 'রক্ত ও লৌহ' নীতিরও তিনি বিরোধী ছিলেন বলে মনে হয় যদিও বিস্‌মার্কের নাম করে তিনি কখনো কিছু বলেন নি; কিন্তু সেই সশস্ত্র রক্তপাত দ্বারা সমস্যা সমাধানের নীতি থেকে উদ্‌ভূত ফ্রান্সের দুঃখ-দুর্গতি নিয়ে অনেক আক্ষেপোক্তি তরু করেছেন।

যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল তখন তরু লিখেছিলেন: 'সর্বান্তঃকরণে আমি ফ্রান্সের দিকে।' ফরাসী ইতিহাসের প্রতি তাঁর অনুরাগ এত গভীর ছিল যে তিনি ১৮৫১ সালে ফরাসী বিধানসভায় প্রদত্ত ভিক্তর য়ুগোর বক্তৃতা ইংরেজীতে অনুবাদ করে 'এ সীন ফ্রম কন্‌টেম্পরারি হিস্টরি' নাম দিয়ে বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেছিলেন।[১৬] এই বক্তৃতায় ভিক্তর য়ুগো খুব তীব্র ভাষায় প্রস্তাবিত এমন কয়েকটি সাংবিধানিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছিলেন যেগুলি গৃহীত হলে লুই নাপলিয়ঁকে কার্যতঃ প্রায় ফ্রান্সের রাজার পদেই অধিষ্ঠিত করা হত। সাধারণতন্ত্রে ভিক্তর য়ুগের অনুরাগ ছিল প্রগাঢ়। সম্রাটের অধীন শাসন-ব্যবস্থাকে তিনি দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতেন। তাঁর এই মতবাদে তরুর খুব দৃঢ় সমর্থন ছিল বলে মনে হয়। বেঙ্গল ম্যাগাজিনে তরুর আরও একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, তার সঙ্গে ছিল প্রাশিয়ার রাজার বিরুদ্ধে ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করুক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ১৮৭০ সালে মসিয় তিয়ে যে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার অনুবাদ। নিতান্তই একটি বালিকা যে একটি ভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে এমন আন্তরিক আগ্রহ এবং অনুরাগ নিয়ে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এতে বোঝা যায় তরু মনেপ্রাণে কতখানিই যে একজন ফরাসী বালিকা হয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৭১ সালের ২৯ ও ৩০ জানুয়ারীর দিনলিপিতে ফ্রান্সের প্রতি তরুর যে প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, ফরাসী 'স্বদেশপ্রেমী'দের মনোভাবের সঙ্গে তার প্রায় কোনো পার্থক্যই নেই। 'কী সুন্দর দেখেছি পারিকে যখন আমরা কয়েকটি দিন সেখানে কাটিয়েছিলাম। কী সব রাস্তা! আর সৈন্য-বাহিনীই বা কী

বিশাল আর কত তার জাঁকজমক! আর এখন কত নীচে ও পড়ে গিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত শহরের শীর্ষে ছিল ওর স্থান, আর আজ তার কত দুর্গতি।' তরুর বিবেচনায়, ফ্রান্সের যে পতন ঘটেছিল এটি ছিল তার ধার্মিকতার অভাবের দরুণ ভগবানের দেওয়া তার প্রাপ্য শাস্তি। 'হায় ফ্রান্স, কী হতমানই না তুমি হয়েছ! এই লজ্জাকর অবমাননার পর আশা করি তুমি ভগবানের কাজে আত্মনিয়োগ ও তাঁর উপাসনা এতদিন যেরকম করে করেছিলে তার চেয়ে ভাল করে করবে। বেচারা, বেচারা ফ্রান্স! আমার হৃদয় যে বেদনায় কী রকম রক্তাপ্লুত হচ্ছে তোমার জন্যে, তা কী করে বোঝাব?'

মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে, অবিস্মরণীয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ সম্বন্ধে তিনি যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটিতে যেমন তাঁর ফ্রান্স-প্রীতির আরও সাক্ষ্য রয়েছে তেমনি রয়েছে তাঁর পরিণত মানসিকতার প্রকাশ।[১১]

ফ্রান্স—১৮৭০

না, না, ও মরেনি, মরতে পারে না
মৃত্যু এ নয়, রয়েছে বেঁচে,
অনেক রক্তক্ষরণের ফলে
দেখছ না ও যে মূর্চ্ছা গেছে?
ইহুদি-শাসিত ইংরেজ আজ দেখে না ফিরে,
সামারিয় কেউ আছ যদি কাছে
দেখ এসে এই রোগিণীটিরে।
ডেকে ডেকে কারও পাইনে সাড়া,
কে এসে বাঁচাবে, রুধিবে কে এই রুধিরধারা?
বাদামীরঙের চুলগুলি ওর
গুছিয়ে সরাও মুখের থেকে,
চোখ চেয়ে ও যে দেখতে পাবে না
চুল চোখ দুটি রেখেছে ঢেকে।
মুখে দাও ওর শীতল জলের ঝাপ্‌টা জোরে,
নিজেরই রক্তে ডুবে আছে, আছে মোহের ঘোরে।
হয়ত বা সাড়া জাগবে প্রচুর দ্রাক্ষাসবে।

দেখছে কি কেউ, শুনছে কি কেউ,
এইটুকু দয়া কারও কি হবে ?
মহামানবের যাত্রাপথের নায়িকা তুমি যে,—মূর্চ্ছাহত
রবে কি গো চিরকালের মতো ?
মননশীলতা, স্বাধীনতা আর
সত্যের দীপ নির্বাপিত,
সূচনাতে হেরি অত্যাহিত।
কোথা হতে ফিরে আসবে আশা ?
আবার কি সবে ডুবব আঁধারে সর্বনাশা ?

না, না, দেখ ঐ নড়ে ওর দেহ,
ছুটি চোখে ওর আগুন জ্বলে ;
ভাঙা বটে ওর তরবারি, তবু
সাবধান কর শত্রুদলে।

ক্ষণেক দৈবদুর্বিপাকের সময়ে এসে
সবে মিলে ভিড় করেছিল ঘিরে ফরাসীদেশে,
মুখে উপহাস শ্লেষ যে কত,
জয়গর্বিত এ্যাটিলার অনীকিনীর মতো।

দেখ, দেখ, ও যে দাঁড়িয়েছে উঠে,
উঠে দাঁড়িয়েছে এখনই ও যে,
শক্তি আবার ফিরেছে শরীরে,
পেলে বুঝি ফিরে এখনই যোঝে।
ভালে জ্বলে তার উজ্জ্বল এক তারার আলো,
এ ধরার যত আঁধার সহসা কোথা মিলালো ?
নত হও সব দেশ মিলে তার নিকটে গিয়ে,
পুরোভাগে তাকে রেখে পথে নেমে চল এগিয়ে।

লণ্ডনে এসে দত্তরা কিছুদিন চেয়ারিং ক্রস্ হোটেলে রইলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এই সময়ে ১৮৬৯ সালের আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্যে ইংলণ্ডে ছিলেন, তিনি লিখেছেন, 'গ্রোভ্‌নর হোটেলে তাঁদের জন্যে ঘর জোগাড়' করেছিলেন। পরে তাঁরা ব্রম্প্‌টন্-এ ৯ নং সিড্‌নী প্লেস, অন্‌স্লো স্কোয়ার, এই ঠিকানায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সজ্জিত একটি গৃহে উঠে যান। এই বাড়ীটিতেই তরু ও অরু ফরাসী কবিতার ইংরেজী অনুবাদের কাজ আরম্ভ করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: 'বলা বাহুল্য আমি প্রায়ই সেখানে যেতাম এবং আমার দুটি কিশোরী খুড়তুতো বোনের সঙ্গে অনেকটা করে সময় আনন্দে কাটিয়ে আসতাম। সাহিত্যসেবা ও ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ এই সময়েও গোবিন চন্দর ও তাঁর পরিবারবর্গের একমাত্র কাজ ছিল এবং অনেক নিষ্ঠাবান্ খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তাঁদের জানাশোনা হয়েছিল। যখন, ডাট্ ফ্যামিলি এ্যাল্‌বাম প্রকাশিত হল তখন গোবিন চন্দর তার একখণ্ড আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটিতে তিনি তাঁর নিজের রচিত কবিতাগুলিকে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পরলোকগত পুত্রকে নিয়ে লেখা কবিতার স্তবকগুলি তিনি প্রায়ই সাশ্রুনয়নে আমাকে পড়ে শোনাতেন।'[১৮]

তরুর আর একটি পিতৃব্যপুত্র অরুণ চন্দর ডাট্-এর সঙ্গে তরুর একটি বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় এবং তরু ইউরোপ থেকে প্রায়ই তাঁকে চিঠি লিখতেন। অরুণ পরে কেম্‌ব্রিজের কর্পাস্ ক্রিষ্টি কলেজের গ্র্যাজুয়েট হন এবং ইংলণ্ডেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি চিকিৎসক হিসাবে সেখানকার লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন এবং একজন ইংরেজ মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন।

অরু এবং তরু লণ্ডনে বেশ সুখেই ছিলেন এবং যে-সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার জর্জ ম্যাক্‌ফ্যারেন, যাঁর পত্নী অরু তরুদের গান শিখিয়েছিলেন, স্যার বার্টি ফ্রেয়ার, যিনি ১৮৬২ থেকে ১৮৬৭ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের গভর্নর ছিলেন এবং আরও অনেকে। তরু বলেছিলেন যে তিনি ফ্রেয়ারদের সঙ্গে অনেকগুলি দিন উইম্‌ব্‌ল্‌ডনে আনন্দে কাটিয়েছিলেন

শেভালিয়ে হ্য শাত্‌লেঁ ছিলেন এঁদের আর একজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। ইনি ভিক্তর য়ুগোর বন্ধু ছিলেন এবং ফরাসীতে শেক্‌স্‌পীয়ার অনুবাদ করে নাম করেছিলেন।

অরু যদিও বয়সে ছিলেন বড় কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনায় তিনি ছিলেন কম পরিণত। সব বিষয়ে, এমন কি তাঁর পড়াশোনার ব্যাপারেও অগ্রণী হয়ে তাঁর ছোট বোন তাঁকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। দুই বোনের ভালোবাসা ও সখিত্বের মধ্যে কোথাও কোনও খুঁত ছিল না। হরিহর দাস দত্ত পরিবারের এই সময়কার কয়েকটি কথোপকথন লিখে রেখে গিয়েছেন :[১১]

জি. সি. দত্ত : 'শোন অরু, কলকাতায় থাকতে তোমাদের লর্ড্‌ এল্‌.-কে (লর্ড্‌ লরেন্স, ভারতবর্ষের বড়লাট, ১৮৬৪-১৮৬৭, দেখবার খুব ইচ্ছা ছিল। এই যে লর্ড্‌ এল্‌. আমাদের অতিথি হয়ে উপস্থিত।'

লর্ড্‌ এল্‌ : 'আমাকে তোমরা দেখতে চেয়েছিলে,—আচ্ছা! কি দেখছ বল ত? (কিঞ্চিৎ করুণ ভাবে) একজন বৃদ্ধ ভগ্নদেহ অবসাদগ্রস্ত মানুষকে? তোমার হাতে ওটা কি বই?'

অরু : 'মিস্‌ মুলক্‌-এর একটি উপন্যাস লর্ড হ্যালিফ্যাক্‌স্‌।'

লর্ড্‌ এল্‌ : 'ও! তুমি খুব বেশি উপন্যাস প'ড়ো না, ইতিহাস প'ড়ো।'

অরু নিরুত্তর। বোনের হয়ে তরুর উত্তর, 'উপন্যাস পড়তেই আমাদের ভালো লাগে।'

লর্ড্‌ এল্‌. : 'কেন বল ত?'

তরু : 'কারণ, সত্য থাকে উপন্যাসের মধ্যেই। ইতিহাসগুলি সব মিথ্যায় ভরা।'

তরুর এই উক্তিটির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তরুর রচিত ফরাসী ভাষার উপন্যাসটির মুখবন্ধে তাঁর স্মৃতিচারণে মাদ্‌মোআজেল ক্লারিস্‌ বাদে লিখেছেন, 'তরু দত্ত যে উত্তরে এরকম একটা পরস্পর আপাত-বিরোধী কথা বলেছিলেন এতে করে তিনি এটাই প্রমাণ করেছিলেন যে,—ভাবুক প্রকৃতির যে হিন্দুজাতি ইতিহাসের চেয়ে লোককাহিনীকে বেশি মর্যাদা দেয়, তিনি তাদের একজন উপযুক্ত দুহিতা।'

তরু যে অরুকে নিজে থেকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন সেটা অরু বা তাঁদের পিতামাতা কারও কাছেই আপত্তিকর মনে হত না। অরু ক্রমশঃ বেশি

করে সব বিষয়ে তরুর উপর নির্ভর করতে লাগলেন, যা দেখে লোকে জানতে চাইত, দুজনের মধ্যে কে বয়সে বড়। তুলনায় দুজনের মধ্যে অরু ছিলেন বেশি মৃদু স্বভাবের। তরুর স্মৃতিশক্তি অবিশ্বাস্য রকমের প্রখর ছিল ; তিনি তাঁর নিজের করা সমস্ত অনুবাদগুলি মুখস্থ বলতে পারতেন। গোবিন চন্দর বলেছেন, তরু কখনো কোনও কাজ দায়সারা ভাবে করতেন না, অতি যত্নে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখে করতেন। যদি কখনও কোনও অসুবিধা দেখা দিত, তার নিরাকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভাষার অভিধান, এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, ইত্যাদির মধ্যে অনুসন্ধান করা হত, এবং সেই অনুসন্ধানের ফল লিখে রাখা হত। কোনো ফরাসী, ইংরেজী এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃত শব্দ নিয়ে তরু এবং তাঁর পিতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে, প্রায় সর্বদাই দেখা যেত তরুর মতটাই ঠিক। বাজি রাখা হলে সেই বাজি প্রায় প্রতিবার তরুই জিততেন। গোবিন লিখেছেন, "তরু যদি কখনো বাজি হেরে যেতেন, তাহলে তখন তাঁর হাবভাব মনোযোগ দিয়ে দেখা আমার খুবই কৌতুকের এবং আনন্দের জিনিস ছিল। প্রথমে ঝকঝকে একটি হাসি, পরে আমার পাকা দাড়িভরা গালে আঙুলের টোকা, আর সম্ভবতঃ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি মিসেস ব্যারেট্ ব্রাউনিং থেকে উদ্ধৃতি, 'Ah gossip, you are older, more learned, and a man'—বন্ধু গো, তুমি বয়সে বড়, লেখাপড়া করেছ বেশি, তার উপর তুমি হলে পুরুষমানুষ—বা ঐ ধরণের তামাশা করে বলা আর কোনো কথা।"

১৮৩৭ থেকে ১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার এডোআর্ড্ রায়ান। তাঁর সঙ্গেও দত্তদের খুব প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইনি ছিলেন ডিকেন্স, থ্যাকারে এবং আরও কয়েকজন ভিক্টোরীয় আমলের বিখ্যাত লেখকের বন্ধু। বেঙ্গল ম্যাগাজিনের ১৮৭৮ সালের জুলাই সংখ্যায় গোবিন চন্দর তাঁর একটি প্রবন্ধে এঁর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছিলেন। স্যার এডোআর্ড্ মেয়েদের যেসব প্রশ্ন করেছিলেন এবং তরু সঙ্গে সঙ্গেই তার যে জবাবগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি মনে করে রাখার মতন। যেমন, স্যার এডোআর্ড্ জানতে চাইলেন, 'থ্যাকারের মেয়েদের সঙ্গে কি তোমার আলাপ আছে? তারা তো তোমাদের পাড়াতেই থাকে।'

না, তাঁদের সঙ্গে তরুর পরিচয় হয়নি (মিস থ্যাকারের সঙ্গে পরে কেম্ব্রিজে তরুর পরিচয় হয়েছিল)।

স্যার এডোআর্ড্ এরপর প্রশ্ন করলেন, 'থ্যাকারের বইগুলির মধ্যে কোন্‌টি তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?'

তরু চটপট উত্তর দিলেন, 'ও, এস্‌মণ্ড্ অবশ্য।...পেণ্ডেনিস তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস, কিন্তু শিল্পকর্ম হিসাবে এস্‌মণ্ডের স্থান নিশ্চয় অনেক উঁচুতে।'

৭ই অক্টোবর তারিখের এক চিঠিতে তরু তাঁর পিতৃব্যপুত্র অরুণকে লিখছেন, মচ্‌কানির একটা ব্যথার জন্যে দুই সপ্তাহ তিনি ঘরের বার হতে পারেননি। ব্রম্প্‌টনে তাঁদের বাড়ীতে পিয়ানো নেই বলে 'বাবা একটা পিয়ানো ভাড়া করে আনবেন।' তরু এবং অরুকে পড়াশোনা করতে হচ্ছিল মিসেস ললেস্ নাম্নী একজন গভর্নেসের কাছে। প্রায় এই সময়েই তাঁদের আর-এক পিতৃব্যপুত্র ওমেশকে লেখা এক চিঠিতে তাঁদের দিন লণ্ডনে কী ভাবে কাটত তার মোটামুটি একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। কাজের তালিকাটি দুটি অসুস্থ মেয়ের পক্ষে যেমন ছিল আয়াস-সাপেক্ষ তেমনি ছিল তার কড়াকড়ি। অবশ্য ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর যখন তরু তাঁর লণ্ডনবাসের সময়কার চেয়ে অনেক বেশি পীড়িত, তখন আরও কঠোর নিয়মে বাঁধা কাজের একটি সময়সূচি অনুসরণ করতেন। অবশ্যকরণীয় কাজগুলির যে ভার তিনি স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন, তাতে কি তিনি তাঁর নিজেরই তৈরি কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, না তাঁর পিতার পরামর্শ নিয়েছিলেন তা বলা সহজ নয়; তবে কোন্ দিন কোন্ কাজগুলি তাঁকে নিশ্চয় করতে হবে তা সম্ভবতঃ তরু নিজেই স্থির করতেন। লণ্ডন থেকে ওমেশকে তিনি লিখেছিলেন:

"চিঠি লিখবার সময় আমার প্রায় নেই বললেই হয়, কারণ আমাদের সমস্ত সময় পড়াশোনাতেই দিতে হয়। প্রথমতঃ সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত পিয়ানো বাজানো অভ্যাস করি, তারপর প্রাতরাশ, তারপরে বাইবেল পড়তে বসি। সাড়ে আটটার মধ্যে এটা শেষ হয়, তখন আবার পিয়ানো বাজানো অভ্যাস করি সাড়ে নটা পর্য্যন্ত। তারপর আমি 'টাইম্‌স্' পড়ি, কারণ, যুদ্ধ সম্বন্ধে জানবার আমার দারুণ কৌতূহল।—এবং এ বিষয়ে আমি যে তোমার চেয়ে বেশি ওয়াকেফহাল তা আমি নিশ্চয় করেই বলতে পারি। দশটার সময়

মিসেস্ ললেস্ আসেন। তিনি চলে যান সাড়ে তিনটেয়। তারপর সাধারণতঃ চারটের সময় আমরা বাবার কাছে বসে পড়াশোনা করি এবং শুক্রবারে মিসেস ম্যাকফ্যারেন আসেন আমাদের গান শেখাতে, আর সোমবারে আমরা যাই মিস্টার পোএর কাছে বাজনা শিখতে। তারপর আবার পিয়ানো বাজানো অভ্যাস করি।"

সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভাষা শেখাও চলছিল। ওমেশকে লেখা তাঁর এই চিঠিটি তরু ধর্মপ্রাণার উপযুক্ত ভাষায় শেষ করেছেন এই বলে, 'ভগবান্ তোমাদের সকল রকম বিপদ্ ও পাপ থেকে রক্ষা করুন।'

দত্তরা তাঁদের লণ্ডনের বাড়ীতে একটি ইতালিয়ান ভৃত্য রেখেছিলেন। তার সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলতেন, যাতে ঐ ভাষায় অনর্গল কথা বলা তাঁদের সহজ হয়। ইসাবেল্ নাম্নী রাঁধুনীটি কিছুদিনের মধ্যেই ভারতীয় খানা পাকাতে শিখে ফেলল। 'আমাদের টেবিলে মাটন কাট্‌লেট ও রোলিপোলির সঙ্গে চলে আসে গরম কচুরি বা বাঁধাকপির চচ্চড়ি, বা বান মাছের অম্বল। খুব মজার নয়?' শীতকালে দুবার বরফ পড়েছিল সেকথার উল্লেখ করে, বরফের বল্ নিয়ে খেলা করতে তাঁদের কত যে ভালো লেগেছিল সেকথা বলেন। কখনো কখনো তাঁরা থিয়েটার দেখতে যেতেন এবং যেসব নাটকের অভিনয় তাঁরা দেখেছিলেন তার মধ্যে ছিল 'এমী রব্‌সার্ট্' এবং 'এ মিড্‌সামার নাইট্‌স্ ড্রিম'।

১৮৭১ সালে দত্তরা কেম্ব্রিজ চলে যান। তাঁরা সেখানে পার্কার পিস-এর উপর রিজেন্ট্ স্ট্রীটে ছিলেন। তরু এবং অরু অত্যন্ত গভীর উৎসাহ ও অভিনিবেশ নিয়ে 'হায়ার লেক্‌চার্স্ ফর উইমেন' শুনতেন। ফরাসী ভাষা শেখাবার জন্য মসিয় বগুএল্ নামক একজন শিক্ষকও তাঁরা রেখেছিলেন। কেম্ব্রিজে তরুদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল মিস মেরী মার্টিনের সান্নিধ্য। এঁর সঙ্গে তরুর আজীবনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, যার ফলস্বরূপ এই দুটি তরুণীর পরস্পরের মধ্যেকার স্মরণীয় এবং প্রায় অমরত্ব লাভের যোগ্য পত্রালাপের নিদর্শনগুলি আমরা লাভ করেছি। বস্তুতঃ বহু বৎসর পরে তরুর জীবনীগ্রন্থ সঙ্কলনের সময় হরিহর দাসের খুবই কাজে এসেছিলেন এই মিস মেরী মার্টিন। ১৯১৩ সালে কলকাতায় মিস্ মার্টিনের সঙ্গে হরিহর দাসের দেখা হয়। সে সময় হরিহর তরুর জীবনী লিখবার তাঁর অভিপ্রায়ের কথা মিস্ মার্টিনের কাছে

ব্যক্ত করেন। মিস্ মার্টিন এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁকে লেখা তরুর চিঠিগুলি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে তাঁর খুবই উপকার করেছিলেন। 'দি লাইফ্ এণ্ড্ লেটার্স অব্ তরু ডাট্' বইটিতে হরিহর দাসের উৎসর্গপত্রটি এই রকম:

তাঁর অতি প্রিয় ভারতীয় বন্ধু
তরু দত্তের এই জীবনীটি মেরী
ই. আর. মার্টিনকে তাঁর
সস্নেহ সহমর্মিতার সকৃতজ্ঞ
স্বীকৃতি স্বরূপ সাদরে উৎসর্গ
করা হল।

মেরী ই. আর. মার্টিন ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা রেভারেণ্ড্ জন্ মার্টিন ছিলেন কেম্ব্রিজের সিড্নি সাসেক্স্ কলেজের সঙ্গে যুক্ত এবং ১৮৫৯ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত সেণ্ট্ ম্যাথুজ দি গ্রেট-এর ভাইকার। ১৮৭২ সালে তরু এবং অরুর সঙ্গে যখন প্রথম মেরীর পরিচয় হয় তখন মেরীর বয়স পনেরো, তরুর ষোল। পরবর্তী জীবনে মেরী মিশনারি হন এবং তরুর মৃত্যুর অনেক পরে ১৯১০ ও ১৯১৩ সালে কলকাতায় আসেন। তরু যখন মেরীকে কেম্ব্রিজে প্রথম দেখেন মেরী তখন মেল্ভার্ন্ ওয়েল্স্-এ স্কুলে পড়তেন।

কেম্ব্রিজে দত্তরা আর একজন যে বন্ধু পেয়েছিলেন, তিনি লক্ষ্ণৌ-এর বিশপ ক্লিফর্ড্। কেম্ব্রিজে প্রোফেসার কাওএলের বাড়ীতে ইনি দত্তদের প্রথম দেখেন। এই প্রোফেসারটির এবং তাঁর স্ত্রীর খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছিল দত্তদের সঙ্গে, যখন প্রোফেসারটি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতেন।

কেম্ব্রিজের বাস সমাপ্ত করে দত্তরা চলে এলেন, তাঁদের ইংলণ্ডবাসের শেষ পর্য্যায়ে, সেণ্ট্ লেনর্ড্ অন্ সি-তে। এখানে তাঁরা নিজগৃহে মসিয় জিরার-এর কাছে তাঁদের ফরাসী ভাষা শেখার কাজ অব্যাহত রেখে গেলেন। তরু তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, এই গৃহশিক্ষকটি 'সপ্তাহে দুবার বা তিনবার বাবাকে ও আমাকে ফরাসী শেখাতে আসতেন। অরু অবশ্য আমাদের সঙ্গে বসে পড়ত না (কারণ তার সাম্প্রতিক রোগ ভোগের পর সে অত্যন্ত দুর্বল

ছিল)। মসিয় জিরার কবিতা খুব ভালোবাসেন এবং ডি. এফ. এ.র দুতিনটি কবিতা ফরাসী পদ্যে তর্জমা করেছিলেন।' তরু ও অরুর যে ফোটোগ্রাফটি পরে মাদ্‌মোআজেল বাদেকে কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছিল, সেটি এইখানে সেণ্ট্‌ লেনর্ড্‌সে তোলা হয়। এই ছবিটিতে অরু উপবিষ্ট অবস্থায় রয়েছেন, এবং তাঁকে খুব ক্লান্ত ও উনিশ বৎসর বয়সের তুলনায় বড় মনে হচ্ছে। অপর-দিকে তরুকে দেখাচ্ছে প্রাণোচ্ছল এবং জীবনী শক্তিতে চনমনে। তাঁর মনোরম কালো চুল তাঁর কাঁধ বেয়ে ঝরণার মতো নেমেছে এবং তাঁর সুন্দর মুখভাবে রয়েছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝলমলে দীপ্তি। তাঁর বয়স তখন সতেরো এবং ছবি দেখে এটা কল্পনা করা শক্ত যে আর পাঁচ বৎসরের মধ্যে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হবে। এমন-কি তাঁর বোনকেও ছবিতে এমন বেশি কাহিল বলে মনে হয় না যে আর পুরো দুটি বৎসরও তিনি বাঁচবেন না। দু'বোনেরই পরনে ভিক্টোরিয়ার আমলে প্রচলিত খুঁটিনাটি সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহ কুচি দেওয়া ফ্রক। এ প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন মনে জাগে, তাঁরা শাড়ী কেন পরতেন না, এবং দেশে ফিরে এসে কলকাতায় থাকতে তাঁরা কখনো ভারতীয় ধরনে সাজসজ্জা করতেন কি না।

তরুর 'এনশ্যেণ্ট্‌ ব্যালাড্‌স্‌ এ্যাণ্ড্‌ লেজেণ্ড্‌স্‌ অব্‌ হিন্দুস্তান' বইটির মধ্যে অন্য নানা বিষয়ের কবিতার সঙ্গে 'হেস্টিংসের অনতিদূরে'—কবিতাটি ছিল। যদিও তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির সমপর্য্যায়ের এটি নয়, তবু এর থেকে অরুর সে-সময়কার শারীরিক অবস্থা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সামান্য সদয় ব্যবহারকে তরু যে কত বড় করে দেখেছিলেন তার কিছু আভাস আমরা পাই।

হেস্টিংসের অনতিদূরে

পাথর ছড়ানো সাগরবেলার সবটা জুড়ে।
সেখানে আমরা ঘুরতেছিলাম এদিক্‌ ওদিক্‌ আপন-মনে
পীচফল-পাকা শরৎকালের মনোরম শুভ শুরুর ক্ষণে।
আকাশ-সাগর দুয়ের নীলে
এক হয়ে দূরে গিয়েছে মিলে।
দিনের তখন বড় বেশি আর ছিল না বাকী,
দূর শহরের গুঞ্জন শুনি, বিদেশী আমরা ফিরি একাকী।

আমরা সেখানে ঘূরতেছিলাম ইতস্তত:
ক্লান্ত চরণে পীড়িত-অর্ধমৃতের মতো।
হঠাৎ আমার সঙ্গিনী নিয়ে অবশ দেহ
বসে পড়ে ; তার মুখে অভিযোগ শুনেছ কেহ ?
সন্ধ্যা ঘনায় পিঙ্গল রঙে, আমিও বসি।
পাশ দিয়ে এক নারী চলে যান বর্ষীয়সী।
করুণ কোমল এত মনোরম মুখের ছবি
আঁকেনি শিল্পী, গানে বর্ণনা করেনি কবি।
দেখেনি তারা
সাধ্বী-সাধিকা-সুলভ কান্তি এমন ধারা।
পাশ দিয়ে কিছু দূরে গিয়ে নারী এলেন ফিরে।
বুঝলেন দেখে, বিদেশী আমরা ; সঙ্গিনীরে
পীড়িত কাতর বুঝে শুধালেন, 'বল ত দেখি,
এসেছ তোমরা ফ্রান্স থেকে কি ?'
নানান কথায় খানিক সময় কাটার পরে
এক গোছা লাল গোলাপ বোনকে দিলেন ধরে।
মনে হল যেন সিক্ত সেগুলি অশ্রুজলে,
'ভগবৎ কৃপা পাও দুজনেই' গেলেন বলে।

কী যে মনোরম ছিল ফুলগুলি, পাপড়ি কত
পূরন্ত বুকে, রক্ত-পদ্মফুলের মতো।
যেই ফুল ফোটে দেশে আমাদের দীঘি ও বিলে,
পুষ্পবাসর সাজাই যা দিয়ে মেয়েরা মিলে।
তারও চেয়ে বেশি মনোরম ছিল নারীর মনের
সেই ভালোবাসা, দিল যা সে-ফুল অজানাজনের
হাতে তুলে। জানি, যে দেবের বরে বেঁচেছি সেদিন,
এ ফুলগুলির কাছে রবে কিছু তাঁরও যে ঋণ।

জানি না কী নাম সেই নারীটির, এই জীবনে
আর যে কখনো দেখা পাব তাঁর হয় না মনে।

তবু ভালোবাসি, বড় ভালোবাসি তাঁরে যে আমি,
সুখী হোন তিনি, এই কর তুমি জগৎস্বামী।
দুঃখশোকের আঁধারে জীবন যদি বা ভরে,
ভুলব না তাঁকে কোনোকালে একদিনেরও তরে।
ফুলগুলি তাঁর আছে ফুটন্ত এই হৃদয়ে,
শুকোবে না এরা, সুবাস এদের যাবে না ক্ষয়ে।

কেম্ব্রিজে থাকতে, ১৮৭২-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৩-এর এপ্রিল পর্য্যন্ত মেরী মার্টিনদের পরিবারের সঙ্গে দত্ত পরিবারের লোকদের প্রায় রোজই দেখা হত। মেরীর মায়ের ডায়েরীতে দত্তদের সঙ্গে করে নিয়ে পথে পথে অনেক হেঁটে বেড়ানো, অনেক ঘরোয়া চায়ের আসর এবং আগুনের ধারে বসে অনেক সন্ধ্যা কাটানোর উল্লেখ আছে। দত্তরা সেণ্ট্ লেনর্ড্‌সে চলে যাবার পরে আর কখনও এই দুটি পরিবারের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। মেরী লিখেছেন, 'হয়ত এই কারণেই আমাদের চিঠিপত্র লেখার মধ্যে আরও বেশি অন্তরঙ্গতা এসেছিল।'

পি. এণ্ড. ও.-র 'পেশোয়ার' নামক জাহাজে করে গোবিন চন্দর ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সপরিবারে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন।

দেশে ফেরা

বিদেশ বাসের সময় তরু যদিও তাঁর ভারতীয় আত্মীয়-বন্ধুদের অনেক চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার অতি অল্প-সংখ্যকই সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে আসার পর তিনি মেরীকে যত চিঠি লিখেছিলেন তার অধিকাংশই মেরী বহুমূল্য সম্পত্তির মতো সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। এই চিঠিগুলি পরে হরিহর দাস প্রণীত তরুর জীবনীতে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩-এর সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে মেরীকে লেখা সর্বসাকুল্যে এই রকম ৫৩টি চিঠি আছে। এই অমূল্য চিঠিগুলিতে তরুর মধ্যেকার আসল মানুষটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল একটি বালিকা, শিখবার এবং লিখবার বাসনা যার অদম্য। তাঁর সহজ সরল চিঠিগুলি থেকে আমরা কলকাতায় তাঁদের পারিবারিক জীবনের অনেক খুঁটিনাটি কথা জানতে পাই। ভাগাভাগি করে তাঁরা রামবাগানে এবং বাগমারির বাগানবাড়ীতে বাস করতেন। ইউরোপে ফিরে যাবার জন্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল তরুর মনে, কিন্তু বাকী জীবন কলকাতা ছেড়ে তাঁর আর বাইরে কোথাও যাওয়া হয়নি।

কলকাতায় তাঁর মা-বাবা, তাঁর বহু আত্মীয়স্বজন এবং খ্যাতনামা বন্ধুদের সমাগম, আর সেই সঙ্গে তাঁর পড়াশোনা এবং লেখা নিয়ে যে জীবন তাঁর ছিল, তার মধ্যে উদ্দীপনা ও আনন্দের উপকরণ যথেষ্টই ছিল। আবার অন্যদিকে নিদারুণ শোকাবহ সেই ঘটনাটিও ঘটে গেল এই সময়,—তাঁদের প্রত্যাবর্তনের এক বৎসরের মধ্যে। অরু যক্ষ্মারোগ-কবলিত হলেন, তাঁকে রক্ষা করা গেল না।

মেরীর কাছে তরুর রাখা ঢাকা কিছু ছিল না। চিঠিগুলিতে স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সুখদুঃখ উজাড় করে তিনি ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু চিঠিতে দুটি তরুণীর মনের কথার আদান-প্রদান এবং সাংসারিক নানা বিষয়ের বিবরণই যে কেবল আছে তা নয়,—সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যও এগুলিতে প্রচুর। হরিহর দাসের মতে তরুর প্রতিভা 'যদি পরিণতি লাভের অবকাশ পেত তাহলে তাঁর এই চিঠিগুলি ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনা-গুলির পাশে স্থান পেত।'

চিঠিগুলিতে তরুর বর্ণনাগুলি যদিও অনেক জায়গায় নিশ্চল বস্তুর ছবির উজ্জ্বলতার কাছাকাছি পৌঁছেছে আর সেগুলির সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর ছলাকলাহীন সরল মতামতের প্রকাশে এবং ভিক্টোরীয় যুগের লেখকদের এক বিশেষ ধরনের রসিকতায়, তবু অনেকেরই মনে হতে পারে যে, তাঁর চিঠিগুলিতে অনেক কথাই কেমন যেন এলোমেলো এবং সেগুলিতে সুসংবদ্ধ চিন্তার প্রকাশ বেশি নেই। তরু মাঝে মাঝে এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যান একটু অসংলগ্ন ভাবে, যাতে তাঁর চিঠিগুলির সাহিত্যিক মূল্য মনে হয় হ্রাস পায়। যেমন, তিনি হয়ত একটি প্যারাগ্রাফে তাঁর আদরের পোষা বিড়ালটির মৃত্যু সংবাদ দিলেন আর তার ঠিক পরেই একজন ফরাসী কবির গুণাবলী নিয়ে আলোচনা চলল। অথবা হয়ত নিজের অসুস্থতার কথা লেখার পরের প্যারাগ্রাফেই তখনকার দিনের কোনও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন। অবশ্য এই ঢিলেঢালা ধরনের লেখা থেকে এটা বোঝা যায় যে, তরুর জীবনে তখন কত বিভিন্ন ধরণের ভাবনা চিন্তা ছিল, এবং তাঁর বালিকা-সুলভ স্বতঃস্ফূর্ত ভাব হয়ত এইটেই প্রমাণ করে যে, তিনি আসলে অসাধারণ রকম কুশলী একজন পত্র-লেখক ছিলেন, কারণ তাঁর চিঠিগুলিতে আগ্রহ নিয়ে ভাববার মতো কথা তিনি ছাপাছাপি করে এত প্রচুর পরিবেশন করতেন, যে পাঠককে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত অবহিত হয়ে থাকতে হত।

বই আর বই, লেখা আর লেখা এই ছিল তাঁর কাম্য, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর বন্ধুর এমন একজন সঙ্গিনী হতে চেয়েছিলেন যাকে দূরে থেকেও ধরা ছোঁওয়া যায়, যাকে সব দিক্ থেকে দেখা যায়, কাছে পাওয়া যায়।

তরুর গোড়াকার চিঠিগুলি লেখা জিব্রাল্টার এবং আলেক্জান্দ্রিয়া থেকে, 'পেশোয়ার' জাহাজে বসে। সমুদ্র-যাত্রার পথের নানা ঘটনার বর্ণনা আছে এগুলিতে। সমুদ্রের দোলানির দরুণ একটু গা গুলনো ছাড়া তরু শরীর যদিও বেশ ভালোই ছিল, তাঁর মনে সুখ বিশেষ ছিল না। অরু খুব ভুগছিলেন। বস্তুতঃ গোবিন চন্দ্র বাধ্য হয়েই দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। অরুর অসুখ এতটাই গুরুতর রূপ নিয়েছিল যে ডাক্তাররা ভাবছিলেন ইংলণ্ডে আর একটা শীত কাটাতে হলে তিনি মারা পড়বেন। বন্ধুকে এ জীবনে আর দেখতে পাবেন না, ভবিষ্যতের এই রকম একটা অশুভ সম্ভাবনার আভাস তরুর মনে ছায়াপাত করছিল।

ভারতবর্ষ থেকে লেখা, তরুর চিঠিগুলি শুরু হয়েছে ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে। দত্তরা সিংহলে পৌছে সেখানে একটা দিন আনন্দে কাটিয়েছিলেন, অবশ্য তারপর তাঁদের গল্-এ চারদিন আটকে থাকতে হয়েছিল। অরু অনেকগুলি পাখি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার মধ্যে বেশ কতগুলি মরে গিয়েছিল, কেবল শ্যামা জাতীয় লিনেট্ পাখি, হলুদে দাগ ওয়ালা গোল্ড্‌ফিঞ্চ্ আর ক্যানারী কয়েকটি বেঁচে ছিল।

দত্তরা ভারতবর্ষে পৌছলে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁরা ফিরে আসাতে খুশি হয়ে দেখা করে গেলেন। যেসব পোষা পশুপাখি তাঁরা রেখে গিয়েছিলেন তারাও মহানন্দে তাঁদের স্বাগত জানাল। আত্মীয়দের মধ্যে যারা তাঁদের বিদেশ যাত্রার সময় খুব ছোট ছোট ছিল তারা এখন বেশ বড় হয়েছে। ফিরে পাওয়া মাসী-পিসীদের তারা কিছুতে কাছছাড়া করবে না, আর তাঁদের আবার বিলেতে ফিরে যাবার কথায় তারা কিছুতেই কান দেবে না।

সেটা যদিও ডিসেম্বর মাস; তাঁদের বাগানে গোলাপ, জবা, গাঁদা তারাফুল এবং অন্য আরও নানা জাতি ফুল ফুটে ছিল প্রচুর। তাঁদের মা অনেকগুলি প্যাকিং বাক্স ভরে ইংলণ্ড থেকে রকমারি গাছের চারা, কন্দ, মূল ও বীজ নিয়ে এসেছিলেন। 'হায়াসিন্থ্‌গুলি সবে বাড়তে আরম্ভ করেছে। আমার আশা হচ্ছে মা ভারতবর্ষে বিলাতী গাছগাছড়ার অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হবেন। আমাদের পুকুরগুলিতে শাদা ওয়াটার লিলি ও লাল পদ্মফুল একসঙ্গে ফুটছে বলে তাদের বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে।'

অরু গিনিপিগ পুষতেন। একসময় এগুলোর এত বাড়বাড়ন্ত হল, যে অরু এদের কতকগুলিকে বেচে দিয়ে, তাঁদের পিতার সকৌতুক মন্তব্যের ভাষায় 'একটা জাঁকালো ব্যবসা ফেঁদে' ফেললেন। অরুকে হাঁসও পুষতে দেওয়া হয়েছিল। 'আমাদের তিনচারটে পুকুর আছে বলে ঐগুলোতে হাঁস রাখার খুব সুবিধা।' টাট্‌কা ফলের জোগান ছিল প্রচুর। 'পেয়ারা, যেগুলিকে কখনো কখনো ইংলণ্ডের পেয়ার ফলের মতো লাগে, কলা, কমলালেবু, যাদের জুড়ি ইংলণ্ডে পাওয়া অসম্ভব।' আমের জন্যে বাগমারির বাগানবাড়ীর খুব নাম ছিল।

এই ভাবে দত্তরা ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর চার বৎসর ব্যাপী তাঁদের শান্ত কিন্তু সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ সংসারযাত্রার কথা মেরীকে লেখা তরুর চিঠিগুলিতে বিবৃত হয়েছে।

'মজা' নামে তাঁদের যে আদরের বিড়ালীটিকে এগারো বৎসরেরও বেশি তাঁরা পুষেছিলেন, সেটি মারা যাওয়াতে পরিবারটির উপর বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এসেছিল। একটা পুকুরের ধারে ঝাউগাছের নীচে একে কবর দেওয়া হয়। তাঁদের মা-বাবা উপস্থিত ছিলেন, অরু আর তরু সে সময় এত অসুস্থ ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। একটা গাই বিইয়েছে, তার ফলে তাঁরা অত:পর টাটকা খাঁটি দুধ খেতে পাবেন। অরুর ইচ্ছা তিনি নিজেই গাইটিকে দোয়ান। বাগানে একটা মস্ত বড় সজারু ধরা হয়েছিল, এবং গোলাপ ফুলগুলি চমৎকার দেখতে হয়েছে। 'আমাদের দেশের ফুলের তুলনায় ইংলণ্ডের ফুলের সৌরভ অত্যন্তই কম।' তাঁরা মুরগী পোষেন। অসুস্থ তরু তখন উপরতলায় শয্যাগত ছিলেন বলে মা সদ্য ডিম ফুটে বেরুনো কয়েকটি ছানা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দেখবার জন্যে। রোজ সকালবেলা তাঁরা টাটকা ডিম খান।

'অরু এখনো একটু বড় রকমের কোনো মাছ ধরবার চেষ্টা করছে না। সে বলছে, তার শরীরে আর একটু বল ফিরে আসা পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করবে; তার ভয় বঁড়শিতে যদি বড় মাছ গাঁথা পড়ে ত পালাবার চেষ্টায় সে হয়ত তাকে টেনে নিয়ে জলে ডুবিয়ে দেবে। এই একই কারণে আমিও বঁড়শিতে বড় মাছ ধরার চেষ্টা থেকে বিরত থাকি।'

বানরেরা একটি ফলে ভরা তেঁতুল গাছ আবিষ্কার করেছে। 'মজা'র ছানাগুলি খুব খেলছে সারাক্ষণ। তরুর কিছুদিন পিয়ানো বাজানো হয়নি, কারণ অসুস্থতার দরুণ তিনি নীচে যেতে পারছেন না। তাঁর এখন ভয় হচ্ছে যে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার মতো সুস্থ অবস্থা তাঁর আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। 'আমি জানি না আমরা যেতে পারব কি না। বাবা এবার বলেছেন, এখানে আমাদের যা কিছু আছে সব বিক্রি করে দিয়ে আমরা ইংলণ্ডে চলে যাব এবং বরাবরের মতো সেখানেই থাকব। আমরা যেখানেই যাই, ভগবান্ যেন আমাদের সকলের সঙ্গে থাকেন।'

দত্তদের গার্হস্থ্য জীবন ছিল শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল। মা গান করতেন, আর ছোট ছোট তিন ভাইবোন মিলে যখন মায়ের গান শুনতেন তখনকার কথা ভেবে বিগত জীবনের জন্যে তরুর মন কেমন করত। অব্জু ও অরুর মৃত্যুর পূর্বে

কলকাতায় তাঁদের ছেলেবেলা যে কী আনন্দে কেটেছিল, তরুর 'সীতা'[২০] কবিতাটিতে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে আঁধার করা ঘরে
দেখছে কী চোখ বড় বড় করে ?
নিবিড় সে এক অরণ্য, তার লতাপাতার ঘেরে
কি লুকানো দেখতে এসে নিরাশ হয়ে ফেরে
রবির আলো। মাঝখানে তার সবটা আকাশ রয় না যেন ঢাকা,
এমনতর জায়গা আছে মুক্ত করে রাখা।
চারপাশে সেই ঘন বনের ব্যূহ
ভেদ করে কেউ আসে যদি, দেখবে মহীরুহ
সেইখানেও আছে কিছু। আলিঙ্গনে জড়ায়
তাদের যেসব বন্যলতা, কী সুগন্ধ ছড়ায়
বড় বড় ফুলে তাদের। স্বচ্ছ সরোবর,
শুভ্র মরাল ভেসে বেড়ায় আলস্য-মন্থর।

সেথায় কাঁটাবনের
আড়াল থেকে শব্দ করে পক্ষ বিধূননের
ময়ূর বেগে উঠে আসে। বন-হরিণের পাল,
পাল্লা দিয়ে ছোটে। হলে শস্য পাকার কাল
ছোট ছোট ক্ষেতগুলি পায় চম্‌কা-আলোর ছোঁওয়া,
হলুদ বরণ শস্য দোলে। বাতাসে নীল ধোঁয়া
ছড়ায় কত অজানিত যজ্ঞবেদীর হবি।
—শান্তিতে বাস করেন সেথায় তপস্বী এক কবি।

কিন্তু কে এই রূপবতী ? তাঁর নয়নের জল
হয় না ত নিষ্ফল।
একটি বিন্দু অশ্রু যে তাঁর, তিনটি জোড়া চোখে
অনেক অশ্রু হয়ে ঝরে, তাঁরই জন্যে শোকে
নুয়ে পড়ে তিনটি ছোট মাথা।

এই পুরাতন কাহিনী, আর এই যে প্রাচীন গাথা,
কোন্ সেকালের দুঃখিনী সেই সীতায় ডেকে আনে,
যায় শোনা সে মায়ের একটি গানে।
সে গান সারা হলে
মিলায় তপোবনের ছবি অন্ধকারে গলে।
কেবল তাদের চোখে যখন নামবে ঘুমের ঘোর,
স্বপ্নে জেগে রবে ছবি, যতক্ষণ না রাত্রি হবে ভোর।

হায় রে, আবার কবে
তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে এমনি জমা হবে
পুরনো সেই দিনের মতো মাকে তাদের ঘিরে,
সন্ধ্যা যখন অন্ধকারে ঢাকবে ধরণীরে।

বাংলার মায়েদের এই সব গান কি প্রাণবন্তই না-জানি ছিল। প্রতি দিন সন্ধ্যায় এই প্রাচীন করুণ গাথাগুলি শুনে তরুর যে কান্না পেত এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

রোজকার কর্মসূচির মধ্যে পড়াশোনার অংশটাই ছিল সবচেয়ে বড় এবং তরুর বাবা নিশ্চয় এই পাঠানুরাগকে উৎসাহ দিতেন। রামবাগানের লাইব্রেরির তাবৎ গ্রন্থ বাগানবাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেখানে জায়গাও ছিল প্রচুর আর তরু, তার যত প্রাণ চায়, পড়তে পারতেন। 'এদিকে আমাদের নিজেদের লাইব্রেরি, আর ওদিকে ক্যাল্‌কাটা লাইব্রেরি, যার মূলধনে বাবার অংশ আছে, এই দুই মিলিয়ে বইয়ের অভাব আমার একেবারেই নেই'—তরু লিখেছিলেন। তিনি খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারতেন এবং লিখেছিলেন, 'আমি যে এত দ্রুত বই পড়ে শেষ করতে পারি তার কারণটা খুবই স্পষ্ট বলে সহজেই বোঝা যায়। আমি এটা পারি এইজন্যে যে, আমরা এখন সবকিছুর থেকে দূরে সরে এসে অবসর-ভরা শান্ত জীবন যাপন করছি। যে সময়টা আমরা ডিনার, লাঞ্চ্, ব্রেক্‌ফাস্ট্, ক্রোকে, লন্-টেনিস, বা পিক্‌নিক্ পার্টিতে অতিবাহিত করতাম, তার সবটাই এখন বই পড়াতে দিতে পারি। তাছাড়া আমি চিরকালই বইয়ের পোকা যাকে বলে তাই,

যখন আমার একেবারে শিশু বয়স তখনও তাই ছিলাম।' রেভ্যু দে ত্যো মঁদ্-এর প্রতিটি সংখ্যাই নিয়মিত তাঁর হাতে আসত এবং লণ্ডনের 'হ্যাচেট্'রা তাঁকে ফরাসী ও ইংরেজী বই পাঠিয়ে সাম্প্রতিক কালে সকলে কী পড়ছে সে সম্বন্ধে ওয়াকেফ্হাল রাখতেন। মিসেস্ ব্রাউনিং, কার্লাইল, ব্রণ্টে ভগিনীরা, বায়রন, থ্যাকারে, কোল্‌রিজ, টেনিসন, জর্জ্ এলিয়ট, লিটন এবং অন্য আরও কয়েকজন ইংরেজ লেখকের নাম তিনি ক্রমাগতই করে চলেছিলেন। আরও ব্যাপক এবং বিশদ ছিল তাঁর ফরাসী সাহিত্য অধ্যয়ন। তাঁকে খুব আনন্দ দিত মলিয়ের-এর কমিডিগুলো, মিগে-র ইস্তআর দ্য লা রেভল্যুসিয়ঁ, রসেল্-এর প্যাপিয়ে পস্তিয়ুম, ভিক্তর য়ুগো-র লে শাতিমঁা ও লে মিজেরাব্ল্, তেন্-এর ভআইআজ্ ও পিরেজিন এবং সেঁৎতিন্-এর স্তল্। তাঁর প্রিয় লেখক ও তাঁদের লেখা বইয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ও কয়েকটির নাম করা হল। ফরাসী রোম্যান্টিক ধারার লেখকরা এবং 'প্যার্নেসিয়ঁা' বলে পরিচিত 'আর্টের জন্যেই আর্ট্' এই মতাবলম্বী ফরাসী কবিগোষ্ঠীর রচনা ছিল তাঁর নিত্য সহচর।

বাড়ীতে তরু ছিলেন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। হরিহর দাস বলেছেন, 'একটু নাড়া পেলেই ঝরে যাবে এইরকম একটি ফুল, আধফোটা একটি গোলাপের কুঁড়ি, যার সৌরভে এ দেশে তাঁদের গৃহসংসার পরিপূর্ণ হয়ে ছিল।' বালবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলে তাঁকে হয় বোন, নয় দিদি, বলে সম্বোধন করত। এমন কি তাঁর দাদু-ঠাকুরদা, মাসী পিসী মামী খুড়ী, মেসো-পিসে-মামা-কাকারাও। তিনি বিস্ময়কর রকম অতিমাত্রায় কোমলহৃদয়, দয়াবতী এবং বিনম্র-স্বভাবা ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কেন ডঃ হাণ্টার তাঁর সঙ্গে এবং পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছিলেন। লিখেছিলেন, 'আমি বেশ একজন হোমরা চোমরা লোক হয়ে উঠেছি।' পরে আবার লিখেছিলেন, 'ডঃ হাণ্টার আমাকে এবং আমার কর্মক্ষমতাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলে কথা বলছিলেন। সত্যি বলতে কি, খুবই লজ্জা করছিল আমার। কারণ, যা বল আর তাই বল, একটি অনুবাদের বই ত আমি লিখেছি, আর ডঃ হাণ্টার কত কত বই লিখেছেন।'

এই ভাবে, পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে তাঁর নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যেসব ছোট-খাট জিনিস নিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করত তাতে খুশি হয়ে এবং, কবি হিসাবে

যে সম্মান তাঁকে দেখানো হত, অত্যন্ত অমায়িক ও সহজভাবে তাকে গ্রহণ করে তাঁর দিন কাটছিল। তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল অতি সামান্য। —যেমন, তাঁর ক্যানারীগুলির জন্যে একটি মশারি, খুব সকালে উঠে ঘোড়াগুলিকে একবার দেখতে পাওয়া, শিমুল ফুলের ঐশ্বর্য্য দেখে খুশি হওয়া, মায়ের একটি গান শোনা, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে শুয়ে বাবার হাতে নিজের হাত রাখা, এই সব নিয়েই তাঁর ছোট জীবনটিতে তিনি বাঁচতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে মাদ্‌মআজেল্‌ ক্ল্যারিস্‌ ব্যাদে তাঁর একটি লেখায় তরুর যে একটি ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা এতকাল অতিবাহিত হবার পরেও অম্লান রয়েছে।[২১] তরুর চিঠিগুলিতে যে মানুষটিকে আমরা পাই, তাঁর 'মন-খোলা স্বভাব, সংবেদন-শীলতা, মনোরম সততা এবং সরলতার গুণে তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন।'

শুরুতেই শেষ

অরু এবং তরু যে সব ফরাসী কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন, সেগুলি সংগ্রহ করা ও বেঙ্গল ম্যাগাজিনের পোএট্স্‌ কর্নার-এ ছাপবার জন্যে পাঠানো, এই কাজেই দেশে ফিরে আসার পর দত্তদের প্রথম কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এদিকে তরু নূতন নূতন কবিতার অনুবাদ করে যেতে লাগলেন অবিশ্রান্ত, এবং অরুরও কিছু কিছু অনুবাদ তার সঙ্গে যুক্ত হল। বেঙ্গল ম্যাগাজিনে এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয় ১৮৭৪ সালের গোড়ার দিকে। তরু এই সময় 'বুদ্ধিসাধ্য নানা প্রকার কার্য্যে প্রযত্ন এবং কল্পনাভিত্তিক সৃষ্টি, এই নিয়ে একটি অস্থির স্বপ্নের জগতে' বিচরণ করতে লাগলেন। 'সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এই ৪৫টি মাসের মধ্যে তিনি এইসব কাজে কী পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন সেকথা আমরা যখন চিন্তা করি তখন গুরুভার কাজের চাপে তাঁর দুর্বল ক্ষয়রোগাক্রান্ত দেহ যে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এতে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না।'[২২]

বছর ঘুরে এলে, ১৮৭৪-এর একেবারে শুরুতে অরু এবং তরু দুজনেই অসুখে পড়লেন। যক্ষ্মা রোগে অরুর মৃত্যু হবার আগেই ঐ রোগের প্রাথমিক পর্য্যায়ের কতগুলি অসুস্থতায় তরু ভুগতে আরম্ভ করেছিলেন। মার্চ মাসে, তিন মাসের ব্যবধানে, মেরীকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন একটু সুস্থ হয়ে উঠবার পর। কাশিটা তখন একটু কম এবং তাঁর ওজন বাড়ছিল। মে মাস আসতে আসতে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্গদেশের গ্রীষ্মকালের প্রখর উত্তাপের জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছিল। অরুর স্বাস্থ্যের যতটা উন্নতি হবে বলে আশা করা গিয়েছিল তা কিন্তু হল না।

তারপর একদিন অকস্মাৎ অরুর মৃত্যু হল। গভীর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের মানুষগুলির তাঁদের ধর্মবিশ্বাস আঁকড়ে থাকা ছাড়া নির্ভর করার মতো আর কিছু রইল না। এই ধর্মবিশ্বাস এতই প্রগাঢ় ছিল, যে তরু এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আগের তুলনায় দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে লাগলেন। এসময়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর ভগিনীর ভাগ্য তাঁরও জন্যে অপেক্ষা করে আছে, একে তিনি

এড়াতে পারবেন না। সেপ্টেম্বরে তিনি রামবাগান থেকে মেরীকে লিখেছিলেন, 'এতদিন তোমাকে লিখতে পারিনি। আমাদের প্রভু অরুকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। আমাদের পক্ষে এ একটি নিদারুণ পরীক্ষা, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমরা ত জানি তিনি যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্যেই করেন। গত ২৩শে জুলাই অরু আমাদের ছেড়ে গেছেন, তখন বেলা এগারোটা। যদিও তাঁর শেষ অসুখটার সময় তিনি জ্বর, ডিস্‌পেপ্‌শিয়া ও অত্যন্ত বেশি দুর্বলতার দরুণ খুব শারীরিক কষ্ট পেয়ে গিয়েছেন, তবু মনের মধ্যে গভীর শান্তি ও সুখ শেষ পর্য্যন্ত তাঁর অব্যাহত ছিল। পুলের ওপারে আমাদের ছোট সমাধিক্ষেত্রটিতে আমাদের ভাইয়ের পাশে তিনি শায়িত আছেন। আমাদের ছোট পরিবারটির প্রাণের প্রাণ ছিলেন তিনি, তাই তাঁর অভাবে আমরা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করছি। তিনি ছিলেন সদা-প্রফুল্ল, সব কিছুতে সন্তুষ্ট। আমাদের কথা মাঝে মাঝে মনে ক'রো ভাই।'

বছরের প্রথম দিকটায় অরু ও তরু দুজনেই অসুস্থতা সত্ত্বেও বেশ ভালোভাবে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে তাঁদের কাজ শুরু করেছিলেন। অরুর সাতটি কবিতা বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল, শীফ্‌-এর কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি তাঁর লেখা। ভিক্তর য়ুগোর একটি কবিতার অনুবাদ করে 'মর্নিং সেরেনেয়্‌ড্‌' নাম দিয়েছিলেন অরু। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে। অনুবাদটি এড্‌মণ্ড্‌ গস্‌-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি মনে করেছিলেন, অনুবাদটি তরুর করা। কিন্তু আসলে অরু সামান্য যে কটি কবিতা লিখবার সময় পেয়েছিলেন, এটি ছিল তাদের একটি। 'ব্যালাড্‌স্‌ এ্যাণ্ড্‌ লেজেণ্ড্‌স্‌ অব্‌ হিন্দুস্তান' বইতে তাঁর ভূমিকা স্বরূপ স্মৃতিচারণ এবং 'এগ্‌জামিনার' পত্রিকায় 'শীফ্‌'-এর যে সমালোচনা গস্‌ করেছিলেন তাতে এই কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছিলেন।

এখনো দুয়ার বন্ধ ?
পূবের আকাশ হল রাঙা,
ভোরের বাতাস বয়
দিকে দিকে, সদ্য ঘুম-ভাঙা

এই যে ক্ষণটি এল,
গোলাপেরে জাগাল যে এসে.
জাগাবে না সে কি তোমারে সে ?

প্রেম, আলো, গান,
সকলে তোমারে চায়,
করে সবে তোমার সন্ধান।
আলো—যেই আলো, গাঢ় লোহিত বরণ
উর্ধ্বাকাশে করে বিতরণ।
গান—মেলে জোরদার পাখা উড়ে যাওয়া
ভরত-পাখীর কণ্ঠে গাওয়া।
প্রেম—যেই অকৃত্রিম প্রেমে নিরন্তর
ভরে আছে আমার অন্তর।

ছেড়ে থেকে দূরে দূরে
প্রাণধর্ম যা চায় তা ভুলি।
নিয়তিরে ফাঁকি দিতে
কেন এই আকুলি-বিকুলি ?

এ হৃদয়ে প্রেম এল
প্রয়োজনে অন্তরলোকের
তোমারই ত ? ঐ রূপে
প্রয়োজন এ দুই চোখের।

আর ঘুম নয়. শোন কথা,
পথ চেয়ে বসে কাঁদি,
কোথা তুমি, বন্ধু, তুমি কোথা ?

এই অনুবাদ কবিতাটি যে খুবই সুন্দর হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কেননা, ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া ছোট বইখানি খুলে এড্‌মণ্ড্‌ গস্‌-এর মনে হয়েছিল তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে। বইটি হাতে করে তাঁর মনে হয়েছিল, খুব বাজে ধরনের কিছু

একটা এটা হবে। এগ্‌জামিনারের সম্পাদক বইটি জোর করে তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'দেখুন এটার কোনো গতি করতে পারেন কি না।' গস্‌ এগ্‌জামিনার-এর অফিসে এবার যখন যান তখন ১৮৭৬ সালের অগস্ট মাস। ইংলণ্ডে বইয়ের বাজারে মন্দা তখন একেবারে চরমে। গস্‌ লিখেছেন, "একদিন কাগজটির অফিসে গিয়ে পড়েছিলাম, আর প্রকাশকদের গোষ্ঠীসুদ্ধুকে ভর্ৎসনা করছিলাম এই বলে যে, তাঁরা সমালোচনা করার যোগ্য কোনও বই আর পাঠাচ্ছেন না। ঠিক সেই সময় ডাক-পিওন ফ্যাকাশে রঙের পাতলা একটি প্যাকেট নিয়ে এল, তার উপরে ভারতীয় ডাকঘরের অপূর্ব একটি ছাপ আর ভিতরে খুব বিশ্রী দেখতে, কমলা রঙের কাগজে বাঁধাই একটা কবিতার বই। বইটি ভবানীপুরে ছাপা, নাম, 'এ শীফ্‌ গ্লিন্‌ড্‌ ইন ফ্রেঞ্চ্‌ ফিল্‌ড্‌স্‌'।"

মিস্টার গস্‌ ভাবলেন, 'কম-বেশি দু'শ পৃষ্ঠার নোংরা দেখতে এই বইটি, যার মধ্যে একটা ভূমিকা বা পরিচিতি জাতীয় কিছু নেই, এর ভাগ্যদেবতা বিশেষ করে এর জন্যে বাজে কাগজের ঝুড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।' বইটি খুলেই 'মর্নিং সেরেনেয়্‌ড্‌' কবিতাটি তাঁর চোখে পড়ল, আর তাঁর মনে হল, 'কবিতা এতটাই ভালো হলে তা হোয়াট্‌ম্যান কাগজে রুভেয়ার্‌দের দিয়ে ছাপা হয়েছে, না ভবানীপুরের কোনও প্রেস থেকে অস্পষ্ট টাইপে ছাপা হয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাইরের জগতে এসে উৎরেছে তাতে যায় আসে না কিছু।'

বেঙ্গল ম্যাগাজিনের জন্যে অনুবাদ করা অরুর আর যে কটি কবিতা শীফ্‌-এ স্থান পেয়েছিল তার মধ্যে ছিল, জেন্‌সুল্‌-এর 'আমার গ্রাম', বের্‌াঁজে-র 'আমার মায়ের জন্মদিন' ও 'সোলোজ', আর ম্যাদ্যাম ভিয়ো-র 'এমিগ্রেশন অব্‌ প্লেজার' তাছাড়া 'কলিনেৎ' এবং 'বন্দিনী পরী' মোট এই সাতটি কবিতা ছাপা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পূর্বে। অবশ্য মর্নিং সেরেনেয়্‌ড্‌-এর মতো উৎকর্ষে এদের আর কোনোটি পৌছতে পারে নি।

অরুর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তরুও বেঙ্গল ম্যাগাজিনের জন্য সাতটিই কবিতা লিখেছিলেন। অর্থাৎ দুই বোনের মোট চোদ্দটি কবিতা বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। আঁর্নোর যে কবিতাটি 'দি লিফ্‌' নাম দিয়ে তরু অনুবাদ করেছিলেন, তাঁর অনুবাদ কবিতাগুলির মধ্যে সেইটিই সব চেয়ে বেশি সমাদর লাভ করেছিল।

বোঁটার বাঁধন কাটিয়ে খসে পড়া
হলদে পাতা, ওগো শুকনো পাতা,
কোথায় যেতে তোমার এত ত্বরা ?

তুফান এসে দিল তুমুল দোলা
ওক্ গাছেরে, গর্বিত যার মাথা ঊর্ধ্বে তোলা।
আঁকড়ে তাকে থাকার প্রয়াস হল আমার বৃথা।
তারপরে কি দুঃখের দিন, বলব আমি কী তা ?
ঝড়ো বাতাস বইল এলোমেলো,
কোথার থেকে আমায় বয়ে কোথায় নিয়ে গেল !
কত পাহাড় এলাম যে ডিঙিয়ে,
কত বন আর মাঠের উপর দিয়ে।

ঐ শোন তার বাঁশী আমায় ডাকে ;
যাব যেথায় যায় নিয়ে সে, দোষ দেব আর কাকে ?
গোলাপও যায় চলে,
লরেল্‌ও যায় যাবার সময় হলে ;
এই পৃথিবীর সবই যাবে আছেই যখন ধরা,
আঁকড়ে থাকার চেষ্টাতে আর কষ্ট কেন করা ?

সাথীহারা

অরুর মৃত্যুর পর রামবাগানের জীবনযাত্রার ধারা শীঘ্রই আবার অভ্যস্ত পথে ফিরে এল। এমন কি মনে হতে লাগল, যেন গোবিন, তাঁর পত্নী এবং অবশিষ্ট কন্যাটি দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন যে, তাঁরা তাঁদের শোকসন্তাপকে নিজেদের অন্তরের গভীর গোপনে সমাহিত করে রাখবেন, এবং কেবল ভগবান্‌কে আশ্রয় করে এবং তাঁদের পড়াশোনা ও অন্য কাজকর্ম নিয়েই তাঁরা বেঁচে থাকবেন। যেসব বিষয় তরুর মনকে বরাবর আকৃষ্ট করত, সেগুলির প্রতি নিষ্ঠায় তিনি অবিচলিত রইলেন। ইংলণ্ডকে তাঁরা সকলে কীরকম ভালোবাসতেন সেকথা মেরীকে তিনি লিখে জানিয়েছিলেন। সমস্ত কাউন্টিগুলির মধ্যে তাঁর বাবার ওয়েস্ট্‌মোর্‌ল্যাণ্ড্‌-কে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছিল, কারণ ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ সেখানে লেক্‌ উইণ্ডারমিয়ার-এর ধারে থাকতেন এবং সাদি থাকতেন কেজিক্‌-এ। নিঃসঙ্গ ও শোকার্ত তরুর, নিবৃত্তিহীন পাঠানুরক্তি সত্ত্বেও, এখন যেন মনে হতে লাগল তাঁর সময় আর কাটিতে চাইছে না, তাই স্থির করলেন, পাটিগণিতের জ্ঞানটা একটু ঝালিয়ে নেবেন। নিম্নবঙ্গ সে সময় একটা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। এর আগেকার আর একটা দুর্ভিক্ষের কথা তরুর মনে পড়ল, যখন 'স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা সকলে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল, তাদের সব হাড়গুলি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। যখন তাদের খেতে দেওয়া হত তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে এমন গোগ্রাসে তারা খাবারগুলি গিলত যে দেখে মায়া হত। মায়েরা তাদের সন্তানদের হাত থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে খেত। ভোরবেলা সামান্য ডালভাত খেতে পাবে, এই আশাতে তারা কখনো কখনো একটানা কয়েকদিন আমাদের বাগানেই থেকে যেত।'

বিশপ ক্লিফর্ড্‌, যিনি ১৮৭৪ সালে কলকাতায় এসে চার বৎসর কাটান, তিনি দত্তদের এই সময়কার গার্হস্থ্য জীবনের টুকরো টুকরো কয়েকটি মনোরম ছবি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। পুরনো যে মিশন চার্চের তিনি কিউরেট ছিলেন, দত্তরা সেখানে উপাসনা করতে যেতেন। বিশপ ক্লিফর্ডের প্রথম করণীয় কাজগুলির মধ্যে একটি ছিল, কেম্ব্রিজে দত্তদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তাঁদের সঙ্গে তাঁর যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ফিরে যাওয়া। তিনি দেখা করতে এসেছিলেন অরুর মৃত্যুর চার মাস পরে; তারও অনেক বৎসর

পরে তিনি হরিহর দাসকে লিখেছিলেন, 'এই পরিবারের লোকদের সঙ্গে আমার খুব ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ হত, এবং এঁদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান আমার কাছে সর্বদাই খুব উপভোগ্য মনে হত। মিস্টার গোবিন ডাট্ ছিলেন একজন সংস্কৃতিমান্ মানুষ। তাঁর অর্থের কোনও অভাব ছিল না। সাহিত্যচর্চা ও লোকহিতৈষণার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট একজন ভাষাবিৎ। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বেশ কয়েকটি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। আমার মনে হয় না মিসেস্ দত্ত বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষায় কথা বলতে পারতেন, অবশ্য তিনি ইংরেজী একটু একটু বুঝতে পারতেন।'

কয়েক মাস পর দত্তরা আবার বাগমারির বাগানবাড়ীতে চলে যান। কিছুদিন আগে তাঁরা তাঁদের এই নিভৃত আবাসটিতে ফিরে আসার কথা ভাবতেওপারেন-নি, কেননা এখানকার প্রতিটি আনাচ-কানাচ তাঁদের অরুর কথা মনে পড়িয়ে দিত। অরু তাঁর স্বভাবের মাধুর্য্য দিয়ে সমস্ত বাড়ীটিকে যেন পরিপূর্ণ করে রেখে-ছিলেন। সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করার একটা ঝোঁক এই সময় তরুকে পেয়ে বসল। ভারতবর্ষের এই সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা 'শেখার কাজে তরুকে সাহায্য করার আগ্রহ গোবিনেরও মনে ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যে, ভাষা শেখার কাজে তাঁরা যদি পরস্পরের সঙ্গী হন তাহলে তাঁর এবং তরুর মধ্যেকার প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। পিতাপুত্রীর মধ্যে যে একটি গভীর মনের মিল গড়ে উঠেছিল তার বর্ণনা তরু খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন তাঁর দুটি কবিতাতে। একটি তাঁর শীফ্-এর সর্বশেষ কবিতা 'আ মঁ পের্' – তাঁর বাবাকে নিবেদন করা একটি মৌলিক রচনা, অন্যটি 'দি ট্রি অব্ লাইফ'—জীবনতরু নামক ব্যালাড্স্-এর আর একটি মৌলিক কবিতা। এই দ্বিতীয় কবিতাটির সমস্তটা 'লিটেরেচার অব ইণ্ডিয়া'-তে[২৩] তরুর অন্য আরও নয়টি কবিতার সঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছিল।

'আ মঁ পের্'

ঝকঝকে আলো ভরা দিন।
ক্লান্ত দেহ-মন আর মুদিত নয়ন, নিদ্রাহীন
শুয়ে আছি। এক হাত আমার পিতার
রয়েছে আমার হাতে। নিকটতা তাঁর
আছে মোর অনুভবে।

এমনি নীরবে
কতদিন কাটিয়েছি সুদীর্ঘ সময়
আমরা দুজনে; কেন মিছে করা বাক্যবিনিময়,
দুইটি হৃদয়ে বাজে যেই সুর, যদি
দুজনারই জানা থাকে, আর নিরবধি
দু দেহে শিরার রক্ত বয় সমতালে।

আশ্চর্য্য আলোক এক জ্বলে হেনকালে
সহসা, সে-সাথে হল তেমনি সহসা রূপান্তর
পরিবেশটির। দেখি উন্মুক্ত প্রান্তর;
দূর থেকে দূরান্তরে তার যে বিস্তার,
কোনোদিকে কোনোখানে সীমা নেই তার।

সীমাহীন সে প্রান্তর জুড়ে
দূর হতে দূরে
তুষার-ক্ষেত্রের উজ্জ্বলতা যেন, নক্ষত্ররাজির জ্যোতিঃপাতে
মেঘ-কুজ্ঝটিকা-হীন তুহিনশীতল—শীত রাতে,
কেবল নিবিড়তর এ আলোক প্রশান্ত উদ্ভাসে।

বিশাল সে প্রান্তরের মাঝে চোখে আসে
বৃক্ষ এক; স্বপ্ন নয়, আমি আছি সম্পূর্ণ জাগ্রত;—
প্রসারিত শাখা ও প্রশাখা, তাতে পাতা নানামতো,
কোনোটা রূপার বর্ণ মৃত্যুরূপী, কোনোটিতে জীবনের সোনা,
বর্ণিতে তাদের দ্যুতি অক্ষম রসনা।

সে-বৃক্ষের পাশে এক দেবদূত ছিলেন দাঁড়িয়ে,
ক'গাছা পল্লব ছিঁড়ে হাতটি বাড়িয়ে
পরায়ে দিলেন তিনি বেড় দিয়ে আমার মাথায়।
আহা, কি মধুর স্পর্শ অজানা সে গাছের পাতায়!

কোথা গেল শিরঃপীড়া, দপ্‌দপ্‌ শোণিত-প্রবাহ
কপালে শিরায়, কোথা জ্বরের প্রদাহ।

আমি ডেকে বলি উচ্চস্বরে,
'পরাও পিতারও শিরে এক গোছা পাতা দয়া করে
একটি পল্লব ছিঁড়ে
ছোঁয়ায়ে পিতার শিরে
দেবদূত কানে কানে কয়,
'এ হবার নয়!'

এ জীবনে সুন্দরতর
দেখিনি কোনও মুখ পরদুঃখে এমন কাতর,
দিব্যপ্রেমে এমন উজ্জ্বল।
সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে কিছুক্ষণ মুছি অশ্রুজল।
ফিরে চোখ চাইতেই সেই দিব্য আলো
অকস্মাৎ কোথায় মিলালো,
তুষার-আবৃত ক্ষেত্রে নক্ষত্রের আলোর মতন
যে আলো দেখেছি এতক্ষণ।

সে দেবদূতের মুখ আর ত গেল না ফিরে দেখা।
দেখি যে শয্যার পাশে পিতা শুধু একা
আমাকে নজরে রেখে রয়েছেন বসে ধৈর্য্যভরে
আমার একটি হাত তাঁর এক হাতে চেপে ধরে।

এই কবিতাটি, যেটিতে ইন্দ্রিয়াতীত দৈব উপলব্ধির মতোই প্রায় কিছু রয়েছে, মনে হয় তরুর সমস্ত রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যে লোকাতীত দর্শন তাঁর হয়েছে তা ব্লেক্‌-এর দৈব প্রেমের জগৎ লুকিয়ে এক পলকের দেখার সম পর্য্যায়ের। তিনি যে তাঁর পরমতম সুখের সময়ে তাঁর পিতাকেও সেই স্বর্গসুখের অধিকার পাইয়ে দেবার জন্যে অনুনয় করছিলেন, এতে করে বোঝা যায়,

তিনি যে পিতাকে ছেড়ে যাবেন এবং তাঁর পিতা তখনও সময় হয়নি বলে যে একাকী শোকার্ত চিত্তে পশ্চাতে পড়ে থাকবেন, এই চিন্তা তাঁর মনকে কীরকম ভারাক্রান্ত করে রাখত।

তরু যে প্রায়শঃই পরলোক-সম্পর্কিত একটা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির জগতে চলে যেতেন, তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে, এমন কি ফরাসী ভাষায় রচিত তাঁর উপন্যাসটিতেও তার অনেক নিদর্শন রয়েছে। তাঁর শরীর যত বেশি ভেঙে পড়ছিল, ত'ত বেশি প্রশান্তি নেমে আসছিল মনে। বিশেষতঃ তাঁর ভগিনী-বিয়োগজনিত নিদারুণ দুঃখভোগের পরে। এবং যত বেশি করে নিজেকে তিনি ভগবদিচ্ছার কাছে সমর্পণ করে দিচ্ছিলেন, ভগবানের সঙ্গে তাঁর যোগকে তিনি তত বেশি নিবিড় করে উপলব্ধি করছিলেন। যে কারণে, তাঁর 'ব্যালাড্‌স্' বা গাথাগুলিতে যখনই মহা অজানার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ অতীন্দ্রিয় সংযোগ ঘটে, কবিতায় তার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার উচ্ছলতর হয়, এবং তাতে অধিকতর শক্তির পরিচয় প্রকাশ পায়। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ বারবার আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং এর থেকে পাওয়া এক অপার্থিব শক্তিতে তাঁর কবিতাগুলি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। পৃথিবীর সন্তান মানব-মানবী এবং দেবতাদের পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কিত যে পরিকল্পনা হিন্দুরা করেছেন তার ভিতরকার অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে তিনি গভীর গবেষণায় রত হয়েছিলেন। মৃত্যুর দেবতা যমরাজের পশ্চাদনুসরণ করে সাবিত্রী তাঁর মৃত স্বামীর আত্মাটি ফিরে পাবার দাবী জানাতে থাকেন। যমরাজের ভীষণদর্শন মূর্তি তাঁকে ভীত করে না। তিনি বলেন,

সততা এমনই শক্তিধর,
এ প্রার্থনা করি যেন অনুভব করি নিরন্তর
তাহার প্রভাব।

মৃত্যুর মধ্যেও আছে এই সততা, তাই তাকে ভয় নেই। 'হে মৃত্যু আমি একটুও অবসন্ন বোধ করছি না।' এই রকম করে রাজ-তপস্বীও তাঁর আত্মাকে সম্পূর্ণ বশে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তরুর গাথাগুলিতে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির কথা প্রচুর রয়েছে। মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুযন্ত্রণার কোনো

বোধ নেই, আছে কেবল একটি জ্যোতির্ময় জীবনের মধ্যে নব জাগরণ যা, সেণ্ট্ জনের উক্তি অনুসারে, 'অন্ধকারের মধ্যে ভাস্বর এই জ্যোতিঃ; স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবার পর যতজন এঁকে পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই ঈশ্বরের পুত্রের মতো নায়কত্বের অধিকার লাভ করেছেন।'

তরুর অনেক কবিতা বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল, কারণ অরুর মৃত্যুর পর ঐ কাগজটিতে 'পোএট্স্ কর্নার'-এ, টি. ডি, তাঁর নামের এই দুটি ইংরেজী আগক্ষর ব্যবহার করে তিনি লিখতে থাকেন। কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক ছোট কবিতা এই সময় তিনি অনুবাদ করেছিলেন। তীক্ষ্ণ কৌতুক-রসবোধ ও বাহুল্যবর্জিত ভাষার গুণ না থাকাতে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে এগুলিকে স্থান দেওয়া যায় না। তিনি ছিলেন একজন মৌলিক কল্পনা-প্রবণ লেখিকা। অনুবাদ মাত্র হলেও এপিগ্রাম জাতীয় রচনায় তাঁর কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব ছিল না।

মনে হয় ল্যকঁৎ দ্য লীল্ সম্বন্ধে তরু বিশেষ একটা কৌতূহল-মিশ্রিত আকর্ষণ অনুভব করতেন। ১৮৭৪ সালের শেষের দিকে এঁর উপর তাঁর একটি প্রবন্ধ বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। এই ফরাসী কবিটির সঙ্গে তরুর লক্ষণীয় রকমের একটি সমধর্মিতা ছিল। এঁর 'লা মর্ত্ দ্য বাল্মীকি' স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয়দের ভালো লেগেছিল। এড্মণ্ড্ গস্ বলেছেন, 'ইংরেজী অনুবাদে পদ্যের দৃষ্টান্ত সহ এই প্রবন্ধটি লেখার পর তরু জোসেফ্যা স্যুলারি সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। তখন ঐ লেখিকার মধ্যে তিনি যা দেখেছিলেন, তাঁর বিচারবুদ্ধি আরও পরিণত হবার পর হয়ত তরু তার সমর্থন পেতেন না। কারও সাহায্য না নিয়ে লেখা দক্ষ কারিগরের শ্রমসাধ্য কাজের মতো এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে এমন কিছু আছে যা খুবই চিত্তাকর্ষক এবং, এখন, তার চেয়েও বেশি মর্মন্তুদ। তাঁর কাজে আরও নিঃসহায় হয়ে গেলেন তিনি, যখন ১৮৭৪-এর জুলাই মাসে কুড়ি বৎসর বয়সে, তাঁর বোন অরু মারা গেলেন।'[২৪]

১৮৭৪-এর ১৫ ডিসেম্বর মেরী মার্টিনকে তরু লিখছেন, 'বাবা বলছেন, আমরা যে ফরাসী কবিতাগুলি অনুবাদ করেছি, তাদের সংখ্যা দুই শতে পৌঁছলেই তিনি সেগুলিকে ছেপে প্রকাশ করবেন। আমি এখন এদেশীয় একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক মিস্টার দে[২৫] সম্পাদিত বেঙ্গল ম্যাগাজিনে সেগুলি পাঠাচ্ছি।

বাবা চান, যথেষ্ট লেখা জমবার পর সেগুলির একটি সংগ্রহ বই করে বের করবেন।' বেঙ্গল ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যায় হেন্‌রী লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও সম্বন্ধেও তরুর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়।

১৮৭৫-এর গোড়ার দিকে মেরী মার্টিনকে অন্য একটি চিঠিতে বেঙ্গল ম্যাগাজিনের সমালোচনা করে তরু লিখেছিলেন, 'তুমি কি বিশ্বাস করবে, বেঙ্গল ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর সংখ্যা আজও অবধি বেরোয়নি ?' তখন কলকাতায় ছাপাখানার কাজ খুবই মন্থর গতিতে এগোত !

১৮৭৪-এর শেষ দিকে তরু আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে শয্যা গ্রহণ করতে হল। তাঁর নিষ্ঠীবনের সঙ্গে রক্ত দেখা যেতে লাগল এবং তিনি ঘন ঘন জ্বরের আক্রমণে ভুগতে লাগলেন। এসব সত্ত্বেও তাঁর মনে আশা জেগে রইল যে, তিনি আবার বিদেশে যেতে পারবেন, এবং তাঁর ডাক্তারও তাঁকে বললেন, পরের বৎসর বসন্তকাল নাগাদ এটা সম্ভব হতে পারে।

১৮৭৫ সাল

নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে পয়লা জানুয়ারী তরু তাঁর বান্ধবী মেরীকে চিঠি লিখলেন, আর ফেব্রুয়ারীতেই আবার অসুখে পড়লেন। বসন্তকাল শুরু হবার আগে বিদেশ যাত্রার কোনো আয়োজন করা সম্ভব হল না। তরুর অসুস্থতা সমানেই চলতে থাকল বলে সেই বৎসরের মতো ঐ কল্পনাটা তাঁদের ছেড়েই দিতে হল। তরু এই সময় এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর কবিতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে ছিলেন। এঁর কবিতার একটি বই তরুর মা তাঁকে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি 'ব্লীক হাউস' পড়ছিলেন, এবং ফরাসী কবিতা অনুবাদ করে বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ছাপাচ্ছিলেন। ইংলণ্ড থেকেও নূতন কতগুলি বই এসেছিল এ সময়।

এই বৎসর নভেম্বরে প্রিন্স্‌ অব্‌ ওয়েল্‌স্‌ (পরে সপ্তম এডোআর্ড) ভারতবর্ষে আসবেন স্থির ছিল; এর জন্যে তরু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন, আবার সেই সঙ্গে এর নানা প্রতিক্রিয়া বিষয়ে মন্তব্যও করে গিয়েছেন। জুলাই মাসে তাঁর পিতামহীর মৃত্যু হল, কিন্তু তরু অন্ত্যেষ্টিতে উপস্থিত থাকতে পারেননি, কারণ তাঁর বুকে তখন প্ল্যাস্টার লাগানো হয়েছে, যাকে তখনকার দিনে ব্লিস্টার বা বেলেস্তারা বলা হত; এই যন্ত্রণাদায়ক প্রলেপটিকে শ্বাসযন্ত্র-ঘটিত রোগে তখনকার দিনে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা বলে গণ্য করা হত।

সেপ্টেম্বর মাস পড়তেই যুবরাজের ভারত সফরের আসন্নতায় কলকাতার উত্তেজনা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। গোবিনকে একটি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হতে আহ্বান করা হল। এই সমাগত-প্রায় প্রতীক্ষিত ব্যাপারটিকে বাদ দিলে জীবনের ধারা অভ্যস্ত নিস্তরঙ্গ গতিতেই বয়ে চলেছিল বলে মনে হয়। সচরাচর যেমন হত সেইরকম একদিনকার কাজের তালিকা করে তরু যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এই প্রকার: 'আমাদের এখানকার জীবনযাত্রার মধ্যে চাঞ্চল্যকর কিছু নেই এবং তোমাকে দেবার মতো খবরও সেইজন্যে খুব কম। সাড়ে চারটেয় আমি উঠি, আমার নিজের জন্যে এক পেয়ালা ও আমার বাবার জন্যে এক পেয়ালা চকলেট তৈরি করি। তারপর রাতের কাপড় ছেড়ে ভালো কাপড় পরতে যাই। কাপড় ছাড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে

দেখতে পাই মা ও বাবা উঠে পড়েছেন, এবং বাবা তাঁর সকালবেলাকার সিগারটি ধরিয়ে ধূমপান করছেন। এরপর আমি বাড়ীর ছাতে চলে যাই, ভোরবেলার গোড়ার দিকটায় এখানটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। তারপর আমি বাগেৎ ও পিন্নুকে বাঁধা বরাদ্দের মাছ ভাজা খেতে দিই। নীচে এসে এই ঘরের যে জানালাটার ধারে আমি গদিয়ান হয়ে বসি, তার নীচেই জঁাতিয়্ ও জ্যোনেৎ ছোলা ও ভুসির সঙ্গে জই-এর সুস্বাদু ছাতু দিয়ে তাদের আহার সম্পন্ন করে। এই ছাতু ভারতবর্ষে ঘোড়াদের খেতে দেওয়া হয়, অত্যন্ত গরমের মাসগুলিতে তাদের ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে। ঘোড়াদের খেতে দেওয়ার পর শুরু হয় আমাদের সকালের খাওয়া এবং মায়ের নানারকম খুঁটিনাটি গৃহস্থালির কাজ। আমি তখন হয় একটি বই খুলে বসি কিংবা বিড়ালছানাগুলিকে নিয়ে খেলা করি, আর বাবা হয় পড়েন, নয় লেখেন, নয়ত ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যান। বারোটার সময় হয় আমাদের দুপুরের আহার, যেটা সমাধা হবার পর তিনটে অবধি আমি হয় কিছু লিখি কিংবা কিছু পড়ি। তিনটের সময় আমি হয় একটা আতা, কিংবা একফালি বাতাবিলেবু নিয়ে খাই। পাঁচটা বাজলে আমরা সাজগোজ করে বেরিয়ে যাই,—আমি যাই গাড়ী চড়ে হাওয়া খেতে, বাবা আর মা যান আমাদের এক আত্মীয়ের বাগানবাড়ীতে। সাতটায় আমরা ডিনার খাই, তারপর রাত সাড়ে আটটায় এক পেয়ালা চা এবং দশটায় নিদ্রা।'

তাঁর অনুবাদগুলির মধ্যে য়োজিন ম্যানুয়েল্-এর 'একটি আত্মার ইতিহাস' থেকে আমরা বুঝতে পারি, ভগবানের রহস্যময় নানা কার্য্যকলাপ এবং সসীম ও অসীম দুই জগতের মধ্যেকার যোগাযোগ নিয়ে তরু যথেষ্টই ভাবতেন।

অনেকের মাঝ থেকে কখনো কখনো ভগবান্
একটি আত্মাকে ডেকে সঙ্গোপনে সঙ্গে নিয়ে যান।
পার করে নিয়ে যান পথে যত দুঃখ ভয় ক্ষতি,
পথের যা লক্ষ্য, দৃষ্টি নিবদ্ধ কেবল তার প্রতি।
সেখানে পৌছলে পরে যখন দেখেন তিনি তার
মেরুমুখী দিগ্‌দর্শী সূচিকার মতো ব্যবহার,
সৃষ্টির আনন্দ মুখে আবার নূতন করে ফোটে।
এভাবে আত্মাটি তাঁর হাতে নব রূপে গড়ে ওঠে।

রাজপুত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কলকাতায় ময়দানে আতশবাজির বিরাট্ এক সমারোহ হবে স্থির হয়েছিল। তরু লিখলেন, 'ডিউক অব এডিনবরা ১৮৬৯ সালে এখানে এসেছিলেন। আমার মনে পড়ছে তখন বাজি পুড়িয়ে ৯০০ পাউণ্ড খরচ করা হয়েছিল। এটা কি একেবারে আক্ষরিক অর্থে টাকাকে ধোঁয়ায় রূপান্তরিত করা নয়?' স্থির হয়েছিল; এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌড় দেখাতে বাবা তরুকে নিয়ে যাবেন। তরু লিখছেন, 'যেতে পেলে আমি খুব খুশি হব।'

ততদিনে তরুর 'শীফ্ গ্লিনড্ ইন্ ফ্রেঞ্চ্ ফিল্ড্স্' বইটি শেষ হয়েছে।[২৬] বইয়ের শেষ কবিতাটি একটি সনেট; সেটি অনুবাদ নয়, ইংরেজীতে মৌলিক রচনা এবং অত্যন্ত সুন্দর। কোনো কোনো সমালোচকের এটিকে একেবারে নিখুঁত বলে মনে হয়েছে।

আ মঁ পেয়্র্

ফুলদের রূপ খোলে, যতক্ষণ থাকে কোলে
মাতা মৃত্তিকার,
সগোত্র শাখার দলে; তুলে নিলে হয় তার
বর্ণের বিকার।
ম্লানিমা-নিলীন হয় প্রকৃতি যে রঙে তারে
আপনার হাতে
একদা সাজিয়েছিল; যতই যতনে কেন
গাঁথ না মালাতে।

কি সুখের ছিল সেই কল-কোলাহল হতে
দূরে দূরান্তরে
আনমনে ঘোরাফেরা, কভু আলো কভু ছায়া
খেলে যে প্রান্তরে।
সেখানে ফুলেরা মিলে গড়ে তুলেছিল এক
নন্দন-কানন,
আমার অঞ্চল ভরে নিতাম লুণ্ঠন করে
যত চায় মন।

তবু আমা হতে বেশি কেউ ত জানে না কী যে
বিবর্ণ মলিন
হয়ে যেত তারা ঠিক চয়নের পরক্ষণে,
কী যে দীপ্তিহীন
হত সুকুমার রূপ। যদি তোমাদের কারও
সাধ জাগে চিতে
আবার তাদের সেই মরণ-পাণ্ডুর দেহে
প্রাণ সঞ্চারিতে,
ফুটেছিল যে সময় তখন দেখেছ যারা
সেই উজ্জ্বলতা
স্মৃতিকে সহায় হতে সাধো শুনে কবিকণ্ঠে
বাধো বাধো কথা।

বইটির সঙ্কলন যখন শেষ হল তখন তরুর আর বিশেষ কিছু করবার রইল না, তাই তিনি সংস্কৃত শিখবার তাঁর বহুকালের ইচ্ছাটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হলেন। 'সুতরাং বাবা আর আমি এখন সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করব।' ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখে তাঁর সংস্কৃত পাঠ শুরু হল। রামায়ণ ও মহাভারত মূল সংস্কৃতে পড়বার গভীর আগ্রহ ছিল তরুর মনে।

এই সময়টায় বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অন্য কাজকর্ম বরাবর যেমন চলত তাই চলছিল। মিস্ অ্যাডা স্মিথ নাম্নী তাঁদের একজন বন্ধু ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, এবং দত্তরা তাঁকে বাগমারির বাগানবাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। একজন আত্মীয়া এই বিদেশিনীকে তাঁর গহনার বাক্স দেখিয়েছিলেন। মিস্ স্মিথ বাগানটা এবং বাড়ীটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলেন না, 'ধরাতে নন্দন বনের মতো সুখে বাস করবার' এমন একটি স্থান থাকতে তরু এবং তাঁর পরিবারের অন্যরা কেন ইউরোপে ফিরে যেতে আগ্রহী।

এদিকে রাজপুত্রের সফর উপলক্ষে বিপুল প্রস্তুতি চলতে লাগল। ডিসেম্বর এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজা-মহারাজারা কলকাতায় এসে উপস্থিত হতে লাগলেন। কেল্লা এবং বারিকগুলি নূতন করে রঙ করা হল। বিরাটাকার

তোরণ অনেক তৈরি হল। এত সব করা হল, যদিও যুবরাজ এক সপ্তাহ মাত্র এদেশে থাকবেন। একজন রাজা তাঁর নিজের জন্যে মণিমুক্তা-খচিত পোশাক তৈরি করালেন, এতে তাঁর খরচ পড়ল পনেরো লক্ষ টাকা। তাঁর রাজ্যে যুবরাজ যে সময়টুকু থাকবেন তার জন্যে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করবার ব্যবস্থা হল।

ইতিমধ্যে তরুর ফরাসী থেকে অনুবাদগুলি গোবিন চন্দর একজন প্রকাশককে দেখতে দিয়েছিলেন, কিন্তু কলকাতায় তখন প্রকাশকদের সাহসের কিছু অভাব ছিল। এই প্রকাশকটি গোবিনকে আর একজন প্রকাশকের নাম বলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দিলেন। এইভাবে আর একটি বৎসর কেটে গেল, কিন্তু তরুর প্রথম বইটি ছাপা হয়ে যে বেরুবে তার কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তরু তখন আর সবদিক্ থেকে মনটাকে গুটিয়ে এনে সংস্কৃত শেখার কাজেই লেগে রইলেন, এবং ভাষা শিখবার যে অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল, তাতে করে অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ভাষার বই অবলীলায় পড়তে পারার ক্ষমতা তাঁর জন্মাল। কিন্তু দশটি মাস মাত্র তিনি সময় পেয়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য এই সময় এত তাড়াতাড়ি খারাপ হতে লাগল যে, পরের বৎসর সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ, ডাক্তারদের নির্দেশে, তাঁর সময় কাটাবার এই নূতন অবলম্বনটি তাঁকে ছেড়ে দিতে হল। তরু তাঁর বন্ধুর কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষা শেখা খুবই শক্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই ভাষা আয়ত্ত করতে পারবেন বলে আশা করেন, যদিও তিনি বুঝতে পারছেন যে, ছ'-সাত বৎসরের কমে ভালো করে এই ভাষা শেখা সহজ হবে না। সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেই তিনি লিখেছিলেন, তাঁর শিখবার আগ্রহ দেখে তাঁর পণ্ডিত খুশি হয়েছেন এবং তাঁর যেরকম অধ্যবসায় তাতে খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন। যথেষ্ট সময় পেলে তরু সংস্কৃতে যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারতেন না তা বলা যায় না। ১৮৭০-এর জুলাই মাসে তিনি লিখেছেন, 'আমি ভাবছি সংস্কৃত শেখা ছেড়ে দেব।' ব্যাকরণ তাঁর কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছিল। ঋজুপাঠ তিন ভাগ তিনি পড়ে শেষ করেছেন এবং এবার কালিদাসের শকুন্তলা পড়তে আরম্ভ করবেন; কিন্তু কিছুদিন যেতেই তাঁর সমস্ত পড়াশোনার কাজে ছেদ পড়ে গেল।

যুবরাজ এসে ফিরে গেছেন, এবং এই অভ্যাগত বিদায়ের পর কলকাতা বেশ ফিটফাট ও পরিতৃপ্ত হয়ে বিশ্রাম করছে। ১৮৭৬-এর জানুয়ারী ১৩ তারিখে তরু লিখছেন, 'রাজপুত্র গত সোমবার চলে গেছেন। আমি তাঁর প্রীতিকর ও মোটামুটি সুন্দর দেখতে মুখখানা এবং তাঁর কৌতুকোজ্জ্বল নীল চোখ দুটি বেশ ভালো করেই দেখে নিয়েছি।' তাঁর রঙ ফরসা কিন্তু মাথায় চুল কম। তরু তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন বাবার সঙ্গে বেলগাছিয়ায় একটি প্রীতি-সম্মেলনে গিয়ে। কঠোর তিরস্কারের ভাষায় তিনি ভারতবর্ষীয়দের অমিতব্যয়িতার বিবরণ দিয়েছিলেন। কাশ্মীরের রাজা যে উষ্ণীষটি পরেছিলেন তার দাম চল্লিশ লক্ষ টাকা। তিনি যে-সব উপহার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল, ১০১টি কাশ্মীরী শাল, হীরা এবং অন্য নানারকমের মণিমুক্তা-খচিত একটি সোনার গড়গড়া, সোনার তৈরি সম্পূর্ণ চায়ের এবং ডিনারের সেট, এছাড়া আরও বহুমূল্য অনেক জিনিষপত্র যেগুলির কথা শুনলে লোকে বিশ্বাস করবে না।

বাবু জগদানন্দ মুখার্জি রাজপুত্রকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁর পরিবারের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন। তখনকার কালে বাঙালী ভদ্রসমাজে বেশির ভাগ স্ত্রীলোকই ছিলেন পর্দানশীন, এবং তরুর মন্তব্য হল যে, বাবু জগদানন্দ হিন্দুদের একটি প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। বাঙালীদের মনে হচ্ছিল যে, হিন্দু-সমাজকে অপমান ও তার অত্যন্ত অনিষ্ট করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে যুবরাজ কারও বাড়ীতে অভ্যাগত হয়ে যাননি, তিনি জগদানন্দর বাড়ীতে গিয়েছিলেন কারণ জগদানন্দ কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর পরিবারের মহিলাদের তাঁর সামনে এনে পরিচয় করিয়ে দেবেন। একটি পত্রিকা এটাকে একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে অভিযোগ করেছিল। কিছুকাল পর এই ব্যাপারটিকে ভিত্তি করে রচিত একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল, সেজন্যে লর্ড নর্থ্ব্রুক একটি আইন করে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মানুষের বিরূপতা জন্মাতে পারে এমন সমস্ত নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তরু এরপর তাঁর নিরীহ কৌতুকবোধ নিয়ে

গল্পচ্ছলে বলেন, "রাজপুত্র একটি প্রিজ্‌ম্যাটিক কম্পাস দেখে একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, বস্তুটি কি ? ছেলেটি এর উত্তরে বলে 'এ রয়েল কম্‌-কম্‌পাস, ইওর প্রিজ্‌ম্যাটিক হাইনেস'।"

শেষ পর্য্যন্ত তরুর বই ছাপা হতে গেল এবং তরু তার প্রুফ দেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ছাপাখানার ভুলচুকগুলি তাঁর অনেক কৌতুকের খোরাক জোগাত। honour's throne ছাপা হয়েছিল horror's throne রূপে। ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ শীফ্‌ ছাপা প্রায় শেষ হয়ে গেল।

এই সময় 'লা ফ্যাম্‌ দাঁ ল্যাঁদ্‌ আঁতিক্‌' নামক একটি ফরাসী বই তরুর খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। একজন ফরাসী মহিলার লেখা ভারতবর্ষের আদর্শ-স্থানীয়া নারীদের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এটি অনুবাদ করবার জন্যে গ্রন্থকর্ত্রী মাদ্‌মআজেল্‌ ক্ল্যারিস্‌ ব্যাদেকে অনুরোধ করে পাঠালেন। এর থেকে এমন একটি বন্ধুত্বের সূত্রপাত হল যা তাঁর জীবনী ও তাঁর সম্বন্ধীয় স্মারকলিপির অপরিহার্য্য উপাদান স্বরূপ হয়ে রয়েছে। ভারতীয় নারীদের বিষয়ে তাঁর উচ্চ ধারণা ভাষা পেয়েছে মাদ্‌মআজেল্‌ ক্ল্যারিস্‌বাদেকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে ; 'আপনি দেখবেন, আমাদের এই লোককাহিনীগুলি কী চমৎকার, কী উচ্চভাবাপন্ন, আর কী করুণ। দেখবেন, ভারতীয় নারীর পাতিব্রত্য, স্বামীর খামখেয়ালি, দাবীর জবরদস্তি ও অন্যায্যতা সত্ত্বেও তাঁর আনুগত্য, স্পেন্সারের ভাষায়, দেবতা ও জীবনসর্বস্বরূপে স্বামীর পূজার্চনা।'

৪ঠা মার্চ ছিল তরুর জন্মদিন এবং যদিও তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র কুড়ি, তিনি মেরীকে লিখেছিলেন, 'আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, তাই না ?' চিঠিটিতে এরপর ছিল তরুর মন্তব্য সহ একটি পার্শী মেয়ের কথা, যে কৌতূহলী হয়ে জানতে চেয়েছিল তরুর ক'টি ছেলেমেয়ে, এবং তরুর উত্তর যে, তিনি বিবাহিতা নন। 'তুমি ত জান যে বিবাহ হিন্দুদের কাছে একটি মস্তবড় জিনিষ। পনেরো বৎসর বয়সে কোনো মেয়ে অবিবাহিত আছে এমন কখনো শোনাই যায় না আমাদের দেশে।' তখনকার দিনে এদেশে মেয়েদের চব্বিশ বৎসর বয়সেই দিদিমা হবার সম্ভাবনা থাকত। 'বাবা বুড়ো হচ্ছেন, আমিও তাই। এক-এক সময় এমন বুড়ো মনে হয় নিজেকে !'

মাদ্‌মআজেল্‌ বাদে-র বই ফ্রান্স থেকে এসে পৌছাল তরুর জন্মদিনে, আর এদিকে 'শীফ্‌' ছাপা হ'য়ে বেরুল ২৪শে মার্চ তারিখে। এক কপি 'শীফ্‌'

মেরীকে পাঠানো হল এই বলে, 'আমি জানি না কাগজগুলি আমার এই বইটি সম্বন্ধে কী বলবে। অবশ্য তারা হয় সপক্ষে নয় বিপক্ষে বলবে, এবং আমি ঔদাসীন্যের বর্মে নিজেকে আবৃত করে নিয়েছি।'

নিজের সমাজেরও খুব কঠোর সমালোচনা তরু মাঝে মাঝে করতেন। তিনি চান তাঁর পিতামহী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু 'যারা খ্রীষ্টান বলে নিজেদের জাহির করে, তাদের চেয়ে তিনি অনেক গুণে ভালো।' কলকাতা এবং ভারতীয় খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলি লক্ষ করার মতো। 'কলকাতা হচ্ছে দুর্নীতির একটি পঙ্ককুণ্ড।' কেবল হিন্দুদের মধ্যে নয় (তাদের মধ্যে প্রশংসার যোগ্য লোক অনেক আছেন), কিন্তু বাঙালী খ্রীষ্টানদের মধ্যেও নীতিবোধ খুবই নীচুস্তরের। 'আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল এই যে, খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা খুবই খারাপ। তারা মনে করে, এটা বাইরের একটা পোশাকী ব্যাপার যা দ্বারা নিজেদের আসল রূপটিকে ঢেকে কিছু লোক অপকর্ম করে থাকে। যাক, আমি থামব এইখানে। বাঙালী খ্রীষ্টীয় সমাজের লোকদের (অতি অল্পসংখ্যক লোক যাঁরা এর ব্যতিক্রম তাঁদের বাদ দিলে) আচার-আচরণ এমনই যে, তা অত্যন্ত খুশিমেজাজের মানুষের মনকেও বিষাদে ভারাক্রান্ত করে তোলে এবং অত্যন্ত আশাবাদীদেরও নিরুৎসাহ করে দেয়।'

খবরের কাগজগুলি তরু খুব খুঁটিয়ে পড়তেন। চোখে পড়ার মতো কয়েকটি পুলিশ রিপোর্টের বিবরণ তিনি মেরীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। একজন সৈনিক একটা ময়ূরকে গুলী করে মেরে ফেলাতে গ্রামবাসীরা তাকে আক্রমণ করে। সৈনিকটির বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু হল, কিন্তু সে খালাস পেয়ে গেল এই কারণে যে 'ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের চোখে একজন ব্রিটিশ সৈনিকের জীবনের মূল্য খুবই বেশি।'

কয়েকজন সৈনিকের হাতে নয়জন বাঙালী নিহত এবং সাতজন আহত হয়। এছাড়া আরও অত্যাচার অবিচারের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর এই চিঠিগুলিতে। ব্রিটিশদের সম্পর্কে একটা তিক্ততার ভাব এই সময় ব্রিটিশ শিক্ষা-পদ্ধতিতে মানুষ হওয়া তরুর তরুণ মনকে পীড়া দিতে শুরু করেছিল বলে মনে হয়। একটা মামলায় একটি ছেলেকে তিন সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে, সে কয়েকটা কুকুরের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। কুকুরগুলি ছিল একজন ইংরেজের। 'এই সব লজ্জা-

জনক যথেচ্ছাচার, যার আশু প্রতিকার প্রয়োজন, তা নিয়ে খবরের কাগজগুলিতে বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে। আইনের এই বিকট বিকৃতির জন্যে যারা দায়ী সেই ম্যাজিস্ট্রেট ও সেশন জজকে শাসন করা উচিত। তুমি কল্পনা কর এই রকম একটা ঘটনার পরে ইংলণ্ডের কোনো ম্যাজিস্ট্রেট যদি একটি ছেলেকে ঘানি ঠেলতে পাঠাতেন ত সে-দেশে কি রকম হৈ চৈ পড়ে যেত।' এরপর একবার, একজন ইংরেজ তার সহিসকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হলে তাকে শাস্তি দেবার ব্যাপারে লর্ড্ লিটন একটু বেশিরকম ক্ষমাশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'দেখতেই ত পাচ্ছ, একজন ইংরেজ বিচারকের চোখে একটি ভারতীয়ের জীবনের মূল্য কত কম।' এই ব্রিটিশ আসামীটাকে ঘৃণা দেবারও বিরোধিতা করেছিলেন লর্ড্ লিটন। এ সত্ত্বেও লিটনকে তরু শ্রদ্ধা করতেন, এমন কি, ফরাসী ভাষায় লেখা তাঁর উপন্যাসটি লর্ড্ লিটনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

তাঁর অনেক চিঠিতে তরু ভারতীয় বোঝাতে 'নেটিভ' কথাটা ব্যবহার করেছেন। তবে এটা সহজেই বোঝা যায় যে এই শব্দটি তিনি তাঁর স্বদেশীয় স্ত্রীপুরুষদের সম্পর্কে অবমাননা-সূচক কোনো অর্থে ব্যবহার করেননি। ভারতীয়দের, বিশেষতঃ খ্রীষ্টানদের মধ্যে সে সময় 'নেটিভ খ্রীষ্টান' কথাটার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ নিজেদের সঙ্গে ব্রিটিশ ও এ্যাংলোইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টানদের পার্থক্য বোঝাবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকরা কথাটা ব্যবহার করতেন। যাই হোক, তরু এই শব্দটি ব্যবহার না করলেই ভালো করতেন। বাঙালীরা ভাবতেন, কথাটির মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে অশ্বেত জাতিদের তুলনামূলক কদর্য কিছু ছিল, এবং সেই অর্থেই কথাটি ব্রিটিশদের দ্বারা ব্যবহৃত হত। অবশ্য সেই বিগত দিনগুলিতে ভারতবর্ষীয়দের 'নিগার' বলেও তাঁরা অভিহিত করতেন। মিস্ মার্টিন এই নেটিভ শব্দটি প্রয়োগ বিষয়ে তরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তরু তাঁর ভুল বুঝিয়ে দেবার জন্যে বান্ধবীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ভুলটি যাতে আর না হয় তা তিনি দেখবেন।

বাঙালীদের সঙ্গে ব্রিটিশদের আচরণ তরুর মনটাকে খুবই নাড়া দিয়েছিল। তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে আর একটি ছিল এই: যুবরাজের একটি অভ্যর্থনা সভায় একজন ইংরেজ অভদ্রভাবে একজন বাঙালীকে মঞ্চ থেকে ঠেলে

নামিয়ে দিচ্ছে দেখে যুবরাজ তৎক্ষণাৎ তাঁর এডিকংকে পাঠিয়ে ইংরেজটিকে নিরস্ত করেছিলেন।

সমাজে ভারতীয় মেয়েদের স্থান ও মর্য্যাদা বিষয়েও তরু ভাবতেন, কিন্তু কখনো তা নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করেছেন বলে মনে হয় না। মনে রাখতে হবে, তাঁর স্বল্পায়তন জীবনটিতে তাঁর লেখা এবং তাঁর পড়াশোনা এমন ভিড় করে ছিল যে তার মধ্যে সমাজ-সংস্কার বা সমাজসেবার জন্যে উদ্বৃত্ত সময় খুব কমই থাকত। সেই সময়কার একজন ধীমান্ ব্যক্তি আনন্দমোহন বসু, যাঁর সঙ্গে কেম্ব্রিজে তরুর প্রায়ই দেখা হত, একদিন কলকাতায় তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। দত্তদের তখনও মনে আশা ছিল তাঁরা আর একবার ইউরোপে যেতে পারবেন। তরু লিখেছেন: 'তিনি (মিঃ বসু) আমাকে বাল্যকাল উত্তীর্ণ হয়েছে এইরকম বয়সের মেয়েদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁর স্কুলটি দেখতে যেতে বললেন। এই মেয়েদের পিতা-মাতারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোঁড়া হিন্দু নন, তাঁরা ব্রাহ্ম বা কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মমতাবলম্বী। আমরা সম্ভবত: ইউরোপে যাব শুনে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি ভাবছিলেন, আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলবার কাজে আমি তাঁকে অনেক সাহায্য করতে পারব।' নারী হিসাবে তাঁর নিজের সমাজ-ব্যবস্থায় যে মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে তরু বাস করতেন, সেখানে প্রাচীন পন্থার নানারকম বিধিনিষেধের কড়াকড়ি তাঁর কোনও অসুবিধা ঘটাত না। সম্ভবতঃ সেইজন্যে এ দেশের নারীদের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি খুব অল্পই চিন্তা করতেন। অবশ্য ইউরোপে গেলে যে তিনি আরও বেশি স্বাধীন হতে পারেন এমন কথাও তাঁর মুখে শোনা যেত। বাঙালী সমাজে তাঁর বেশি মেলামেশার সুযোগও ছিল না, কারণ সভাসমিতিগুলি ছিল সবই কেবল পুরুষদের জন্যে, স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতেন।

তরুর দিন শেষ হয়ে আসছিল। তরুকে এখন আর গান করতে দেওয়া হত না। তরু লিখেছিলেন, 'বাবা এত সাবধান! আমি তাঁকে বলি, আমাকে একটা কাচের আধারের মধ্যে রেখে দিতে। কারণ, আমাকে যতটা পল্‌কা স্বাস্থ্যের মানুষ বলে তিনি বোঝাতে চান, অথবা নিজে তাই ভেবে ভয় পান, আমি মোটেই সেরকম নই।' বাবা তাঁকে ভিক্‌তর য়ুগোর কয়েকটি বই এনে দিয়েছিলেন, এবং তরু আরও কিছু ফরাসী কবিতা অনুবাদ করছিলেন, কারণ

'শীফ্' বিক্রি খুব ভালো হচ্ছিল এবং তরু আশা করছিলেন বইটির আর একটি সংস্করণ ছাপা হবে। তাঁর কয়েকটি কবিতা ক্যাল্‌কাটা রিভিউয়ে ছাপা হবে বলে মনোনীত হয়েছিল, তাঁর বাবা তাতে খুব খুশি হয়েছিলেন, এবং 'আমিও খুশিই হয়েছি, কারণ এই জাতীয় কাগজগুলির মধ্যে ক্যাল্‌কাটা রিভিউ ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

বেঙ্গল ম্যাগাজিন থেকে তরুর কাছে আরও লেখার জন্য অনুরোধ এসেছিল, এবং তরু স্যুলারি, সোঁৎ ব্যভ্‌, কঁৎ গু গ্র্যাম, ওগুাস্ত্‌ ভ্যাকেরী, তেওফিল্‌ গতিয়ে, ভল্‌তেয়র্‌, ম্যার্নিয়ে, য়ুগো, এবং আরও কয়েকজনের লেখার অনুবাদ তাদের পাঠিয়েছিলেন। বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে গোবিন মন্তব্য করেছিলেন যে, একমাত্র 'শীফ্'-এই স্যুলারির লেখার ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায়।

১৮৭৬-এর ডিসেম্বর মাস যখন এল তরু তখন সত্যই অসুস্থ। তাঁকে যে ডাক্তার সচরাচর দেখতেন তাঁর অনুপস্থিতিতে মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তার স্মিথ এলেন চিকিৎসা করতে। ওষুধ দিয়ে তাঁর রক্তোৎকাশ রোধ করা গেল না। এমন কি, ডিজিটেলিস্‌ও আর ক্রিয়া করছিল না। তাঁর শিরায় সূচি প্রয়োগ করা হল। তরু মেরীকে লিখেছিলেন, "যখন ডাক্তার স্মিথ প্রথম আমায় দেখতে এসেছিলেন, পেশাদারদের কেতাদুরস্ত ছিল তাঁর ধরন এবং তিনি পেশাদারী ধরনেই জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। হঠাৎ টেবিলের উপর, যেখানে কমলালেবু রঙের সমারোহ নিয়ে 'শীফ্' বিরাজ করছিল, সেখানে তাঁর চোখ পড়ল। তিনি যেন হঠাৎ আলোয় একটা কিছু দেখতে পেলেন। বললেন, 'এ বইটি কি তুমি লিখেছ?' আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তার উদ্‌বেগ যে কীরকম দ্বিগুণিত হয়ে গেল তা যদি তুমি দেখতে। 'এই পআত্রিনেয়্‌র্‌ (যক্ষ্মারোগিণীটি) বইটির রচয়িত্রী?' তাঁকে বিস্মিত, এ-বিষয়ে আরও কিছু জানতে আগ্রহী এবং খুশি দেখাচ্ছিল। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, শীফ্‌কে দিয়ে কিছু কাজ অন্ততঃ হয়েছে।"

সমাপ্তি

তরুর জীবন যা কিছু নিয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল মাদ্‌মআজেল্‌ ক্ল্যারিস্‌ ব্যাদে-র সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা। ১৮৭৮-এর ২ ফেব্রুয়ারী এই ফরাসী লেখিকার 'লা ফ্যাম্‌ দাঁ ল্যাঁদ্‌ আঁতিক্‌' নামক বইটি অনুবাদ করবার অনুমতি চেয়ে তরু তাঁকে যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ক্ল্যারিস্‌ তার উত্তরে লিখেছিলেন, 'আদর্শস্থানীয় যে ভারতীয় নারীদের আমি ভালোবাসি, সত্যিই কি তাঁদেরই বংশের একজন চাইছেন, গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচীন আর্য্যদের উৎসর্গ করা আমার বইটি অনুবাদ করতে?' অবশ্য অনুমতি সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দিলেন। প্রাচীনকালের ভারতীয়, হিব্রু, গ্রীক ও রোমীয় নারীদের নিয়ে ক্ল্যারিস্‌ চারটি বই লিখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, বাইবেলে বর্ণিত নারীদের বাদ দিলে, 'সবচেয়ে বেশি পবিত্রতা ও ধর্মনিষ্ঠার' পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতবর্ষের নারীদের স্বভাবে।

এই চিঠির উত্তরে তরু লিখেছিলেন, তিনি একথা বলতে পারছেন বলে গর্বিত যে, 'আমাদের মহাকাব্যগুলিতে বর্ণিত আদর্শ নারীরা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাবার যোগ্য। সীতার চেয়ে বেশি মর্মস্পর্শ করে এবং মনে গভীর প্রীতির সঞ্চার করে এমন আদর্শ নারী-চরিত্র হওয়া সম্ভব কি? আমার ত তা মনে হয় না।' ক্ল্যারিসের সঙ্গে দেখা হবে তরুর মনে এই আশা ছিল কিন্তু তা হল না। কারণ, ১৮৭৭ সালেই ১৩ এপ্রিল তিনি তাঁর এই ফরাসী বান্ধবীকে জানালেন, তিনি বাস্তবিকই বড় বেশি অসুস্থ। 'আপনার কাছ থেকে একটি চিঠি আর সেই সঙ্গে আপনার একটি ছবি পেলে আমার উপকার হবে। আমাদের সমস্ত প্ল্যানই গিয়েছে বদ্‌লে। এপ্রিলে ইউরোপ যাওয়া আমাদের হয়ে উঠবে না। উপস্থাপনা মানুষের, ব্যবস্থাপনা ভগবানের।' এই চিঠি পেয়ে খুব উদ্‌বিগ্ন হয়ে ক্ল্যারিস্‌ লিখলেন, তরুর রচনা এবং চিঠিগুলি একটি মার্জিত রুচি ও মনোরম অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয়বাহী, এবং তরুর সঙ্গে হয়ত দেখা হবে না জেনে তিনি সত্যই নিরাশ হয়েছেন। মৃত্যুর এক মাস আগে ৩০ জুলাই তারিখে কয়েকটি ছত্র ছাড়া তরুর আর কিছু লেখা হল না। এত শীঘ্র তাঁর জীবনাবসান ঘটবে জানতেন না বলে ক্ল্যারিস্‌ সেপ্টেম্বর মাসে লিখলেন,

একবারের ডাক তিনি ধরতে পারেননি বলে চিঠি দিতে দেরি হল। 'কী আশ্চর্য্য! আপনার ছবিতে আপনার স্বভাবের যে বলিষ্ঠতার ছাপ রয়েছে, আপনার অসুস্থতার জন্যে কি তা সামান্য পরিমাণেও হ্রাস পাওয়া সম্ভব? আপনার ঐ প্রদীপ্ত সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে যেতে পারে? আহা! কিন্তু এটা অবস্থার একটা সাময়িক অবনতিও ত হতে পারে?'

ক্ল্যারিস্ প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন যখন তিনি ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা গোবিনের চিঠিতে জানতে পারলেন, তাঁর দুহিতা ৩০ অগস্ট তারিখে ইহলোক ছেড়ে গেছেন। যে ক্ল্যারিস্ একবারও চোখে না দেখে তরুকে ভালোবেসেছিলেন তিনি এই বাঙালী নারীকবিটির মধ্যে ভারতীয় খ্রীষ্টানদের এমন একটি প্রতিনিধিকে দেখেছিলেন, যিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে যা সর্বোত্তম তাকে ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চার সঙ্গে মিশ খাইয়ে একটি অভিনব বস্তু মানুষের কাছে উপস্থিত করেছিলেন

তরুর জীবনের শেষ বৎসরটিতে তাঁর অনেক খ্যাতনামা বন্ধু তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিলেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার উইলিয়াম হাণ্টার এবং আনন্দমোহন বসু। পড়াশোনার মধ্যে তিনি আরো যেন বেশি করে নিজেকে ডুবিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি সেঁ্যৎ ব্যভ্ ও ভিক্তর য়ুগোর বইগুলি পড়ছিলেন। এদিকে হ্যাচেট্রা তাঁকে নতুন বইয়ের একটি জোগান পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তরু তখন এতই অসুস্থ যে তাঁর পড়বার মতো অবস্থা আর ছিল না। জুন মাসে তরু মেরীকে লিখেছিলেন যে তাঁর ডানদিকের কণ্ঠার হাড়ের নীচে এক পক্ষকালের মধ্যে তিনটি বেলেস্তারা লাগানো হয়েছে, এবং ঐগুলি তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছে। 'যন্ত্রণা আমাকে যেন পাগল করে দেয়। একটা ত শুকোয়নি আজও পর্য্যন্ত।' এর পরের মাসে তিনি লিখেছিলেন, 'সুস্থির চিত্তে এই ক্রুশভার বহন করতে ভগবান্ আমাদের সাহায্য করুন,' আর সেই সঙ্গে নিউম্যানের স্তোত্রটি উদ্ধৃত করেন, 'একটি দীর্ঘশ্বাস বা একবিন্দু অশ্রুও আমার কম জুটুক এ আমি চাই না।' ১৮৭৩ সালে তরুরা ভারতবর্ষে ফেরার পর মেরীকে লেখা এটি তাঁর ৫৩তম এবং শেষ চিঠি।

এবারে দুটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কথা কল্পনা করা যাক, যাঁরা তাঁদের বড় আদরের তিনটি সন্তানকেই হারিয়ে কেবল চিরকালের জন্যে ধরে রাখা তাদের কণ্ঠস্বর-গুলির স্মৃতি নিয়ে নিজেরা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিলেন। বাগানে তাদের

রোপণ করা গাছগুলিতে ফুল ফুটেছে, যে ঝি-চাকরদের তারা ভালোবাসত, তাদের আদরের ঘোড়াবিড়ালগুলি, সবাই রয়েছে, কিন্তু কোথায় তাঁদের সেই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কলাবতী দুটি কন্যা, কোথায় গেল তরুর হাসি আর গান? যাই হোক, অব্‌জু এবং অরুকে সঙ্গে নিয়ে তরু তাঁর পিতামাতার সঙ্গে আবার মিলিত হবেন। তাঁদের সে মিলনে আর কোনোদিন ছেদ পড়বে না। খ্রীষ্টধর্ম থেকে সেই আশ্বাস তাঁরা পেয়েছিলেন।

তরু মারা যাবার পর তাঁর একটি গোপনে রাখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি গোবিন খুঁজে পেয়েছিলেন। এরপর আরও কয়েক বছর গোবিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর সন্তানদের, বিশেষ করে তরুর স্মৃতি, এবং তরুর উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলেই বোধ হয় বেঁচে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

চারপাশে ছড়ানো বইয়ের মধ্যে তরু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মেরীকে তরুর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে গোবিন লিখেছিলেন, জুলাই মাস পর্যন্ত পাওয়া তাঁর সব চিঠিই তরু পড়েছিলেন, এবং সেগুলির থেকে তিনি প্রচুর সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। শেষ মুহূর্তটি এল ৩০শে অগস্ট, রামবাগানে। তরুর বয়স তখন একুশ বৎসর চার মাস। তিনি ইহলোক ছেড়ে গেলেন 'তাঁর ত্রাণকর্তা যীশু-খ্রীষ্টের উপর দৃঢ় নির্ভর নিয়ে এবং পরম শান্তিতে।' কন্যার মৃত্যুর পর দিন গোবিন মেরীকে লিখেছিলেন, 'তরু এই পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। কাল রাত আটটায় তিনি আমাদের ত্যাগ করে গেছেন এবং শেষ সময়টিতে তাঁর অন্তরে ছিল পরম শান্তি।' আপার সারকুলার রোডে সি. এম্. এস্. সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধিটিতে উৎকীর্ণ ইংরেজী লিপিটির ভাবার্থ এই প্রকার:

তরু ডাট্

গোবিন চন্দর ডাট্-এর কনিষ্ঠা কন্যা

জন্ম ৪ মার্চ, ১৮৫৬

মৃত্যু ৩০ অগস্ট, ১৮৭৭

আমৃত্যু বিশ্বাস রেখে চল

জীবনের রাজমুকুট তোমাকে আমি পরিয়ে দেব।

রিভিলেশন্‌স্, আই-আই ১০

তরু দত্ত, তাঁর ভাই এবং তাঁর ভগিনীর বিষাদমণ্ডিত সমাধিগুলি আজও অবধি তিনটি তরুণ জীবনের অকাল-সমাপ্তির সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রয়েছে। কত কী যে হতে পারত কিন্তু হল না, এগুলিকে দেখলে সেই চিন্তাই কাঁটার মতো মনে বেঁধে। অন্য কথার মধ্যে গোবিন চন্দর ক্ল্যারিসকে লিখেছিলেন : 'সে আমাদের পরিত্যাগ করে এমন এক দেশে গিয়েছে যেখানে বিচ্ছেদ এবং দুঃখ কারো জানা নেই। তার ত্রাণকর্তার উপর তার নির্ভর ছিল অপরিসীম, এবং তার আত্মা বুদ্ধির অগম্য এক পরাশান্তি সম্ভোগ করে গিয়েছে। তার চেয়ে মধুরতর স্বভাবের সন্তান কারো হয় না আর সে ছিল আমার শেষ সন্তান। আমি এবং আমার স্ত্রী আমাদের এই বৃদ্ধবয়সে নিঃসঙ্গ পড়ে আছি একটা শূন্য খাঁ খাঁ করা বাড়ীতে, যে বাড়ীটি একদা আমাদের তিনটি বড় আদরের সন্তানের কলরবে মুখরিত হত। কিন্তু আমরা বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাইনি। সান্ত্বনাদাতা আমাদের সঙ্গে আছেন ; এবং এমন দিন আসবে যখন আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে একসঙ্গে হয়ে আবার মিলব, তারপর আর কখনো আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।'

একটি গুচ্ছ

'এ শীফ্ গ্লিন্ড্ ইন ফ্রেঞ্চ্ ফিল্ড্স্' বইটি তরু ম্যাড্যাম গোবিন্ সি. ডাট্-কে, অর্থাৎ ক্ষেত্রমণিকে, জার্মান কবি শিলার থেকে এই উদ্ধৃতিটি দিয়ে উৎসর্গ করেছিলেন :

> এনেছি যে ফুল আর ফল,
> অন্য এক জমির ফসল।
> অন্য রৌদ্রে দীপ্ত সেই দেশ,
> আবহাওয়াতে বেশি সুখাবেশ।[২৭]

যদিও ১৮৭৬-এর মার্চ মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণটিতে ভূমিকা বা পরিচিতি জাতীয় কিছু ছিল না, তবু বইটি দেখতে যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মতো ছিল তা একেবারেই বলা চলে না। ভারতীয় সংস্করণটি ছিল ২৫২ পৃষ্ঠার একটি বই যার ৪০ পৃষ্ঠা জুড়ে ছিল তরুর নোট্স্ বা টীকাগুলিতে ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বহু ব্যাপক ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। ১৬৫টি কবিতার মধ্যে ৮টি ছিল অরুর রচিত, বাকীগুলি তরুর। যে প্রায় ৭০ জন প্যারিসিয়ান 'চারুকলারই জন্যে চারুকলা' এই মতবাদে বিশ্বাসী ফরাসী কবির কবিতার অনুবাদ ছিল বইটিতে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন: দ্যু বেলে, দ্যু বার্তা, স্ক্যার, ম্যাড্যাম ভিয়োে, পিয়ের্ কর্নেয়্, দ্য প্যার্নি, ল্য কঁৎ দ্য গ্র্যাম, দ্য ফ্লরিয়ঁা, দ্য ভিন্যি, শেনিয়ে, ম্যুসে, বের াঁজে, সঁৗৎ ব্যভ্, ব্রিজ্যো, দ্যুপঁ, ভি. দ্য ল্যাপ্যার্দ্, ম্যাড্যাম অ্যাকেরম্যান, ভিক্তর য়ুগো, লামার্তিন্, বোদ্লেয়র্, ল্যকঁৎ দ্য লীল্, ম্যাড্যাম দেবর্দে-ভ্যাল্মর্ এবং আরও অনেকে।

প্রথম সংস্করণটি বিক্রি শুরু হবার খুব অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়াতে তরু দেরি না করে আর একটি সংস্করণ প্রকাশের তোড়জোড় আরম্ভ করলেন। অবশ্য তিনি বেঁচে থাকতে এটির কাজ শেষ হয়নি। প্রথম সংস্করণে ফিকে নীল রঙের মলাট ও তার ওপর সোনার জলে নাম লেখা ছিল। ১৮৭৬ সালে 'এগ্জামিনার'-এর অফিসে বইটি দেখে গস্-এর কেন যে এটিকে কমলা রঙের এবং বিশ্রী দেখতে মনে হয়েছিল তার কারণ মেরীকে লেখা

একটি চিঠিতে তরু ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। বইটি অবাঁধা অবস্থায় কাগজের মলাট পরিয়ে পাঠানো হয়েছিল। বইগুলিকে এইভাবে ইউরোপে পাঠানো হয়েছিল, কারণ ওগুলো প্যাক করে ডাকে দেওয়া সহজ ছিল। এই রকমের অকিঞ্চিৎকর দেখতে একটি পুস্তিকা যে কারও চোখে পড়েছিল তা একমাত্র কবিতাগুলির গুণেই। বৈদেশিক সমালোচকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম করার মতো ছিলেন, ফ্রান্সের আঁদ্রে তেওরিয়ে এবং ইংলণ্ডের এড্‌মণ্ড্‌ গস্‌।

ভবানীপুরের যে 'সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস' প্রথম সংস্করণটি প্রকাশ করেছিলেন তাঁরাই ১৮৭৮ সালে একটি নূতন সংস্করণ ছাপলেন। এটিতে তরুর শোকাতুর পিতা ১৮৭৭ সালে লেখা তরুর একটি জীবন-বৃত্তান্ত ভূমিকাস্বরূপ জুড়ে দিয়েছিলেন।

এই ভূমিকাটিতে গোবিন এই বলে শোকাবেগ প্রকাশ করেছেন যে, চিকিৎসা ও পরিচর্য্যাদির যতদূর সম্ভব ভালো ব্যবস্থা করেও তিনি তরুকে বাঁচাতে পারলেন না। পরবর্তী এই সংস্করণটিতে ৩০টি নূতন অনুবাদ সংযোজিত হয়েছিল যার ফলে বইটিতে মোট কবিতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২০০। কবিতাগুলিকে নূতন করে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, এবং দুই বোনের একত্র তোলা একটি ছবি দেওয়া হয়েছিল বইটির শুরুতেই। লণ্ডনে মেসার্স্‌ কেগান্‌ পল্‌ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বইটির একটি তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। দুটি কবিতাকে স্যার রোপার লেথ্‌ব্রিজ 'দি ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন এ্যাণ্ড্‌ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতা সঙ্কলনের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। 'দি পোএট্রি অব্‌ তরু ডাট্‌' নাম দিয়ে তরুর কবিতা বিষয়ে একটি প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন।

'শীফ্‌' প্রথম ছাপা হয়ে বেরুবার পর সমালোচকেরা কী বলে দেখবার জন্যে তরু অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম সমালোচনাগুলির মধ্যে বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ১৮৭৬-এর মে মাসে যা ছাপা হয়েছিল তা এই : 'টি. ডি. বলে যিনি স্বাক্ষর করেন তাঁর অনবদ্য সুন্দর এই কবিতাগুলির বেশির ভাগ আধুনিক ফরাসী কবিদের লেখা থেকে অনুবাদ। বেঙ্গল ম্যাগাজিনে বিগত দুই বৎসর ধরে মাসের পর মাস প্রকাশিত এগুলি পাঠ করে এই পত্রিকার পাঠকরা নিশ্চয় গভীর আনন্দ লাভ করেছেন। সেই কবিতাগুলির সঙ্গে আরও কিছু কবিতার সংগ্রহ সংযোজিত হয়ে বড় আকারের ২৩৪ পৃষ্ঠার একটি

বই হয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ; এবং বেঙ্গল ম্যাগাজিনের টি. ডি. পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ডাট্ ফ্যামিলি অ্যাল্‌বাম্-এর সম্পাদক বাবু গোবিন চন্দর ডাট্-এর বহুগুণান্বিতা কন্যা মিস্ তরু ডাট্-এ পরিণত হয়েছেন। তিনি কলকাতার রামবাগানের, সম্ভবতঃ বাংলাদেশের সব্‌চেয়ে বেশি ধীশক্তিসম্পন্ন, দত্তপরিবারের মানুষ। এই পরিবারের অধিকাংশ লোকরাই নিজেদের প্রতিভার জোরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাবু রসময় দত্ত ছিলেন একজন অসাধারণ কৃতী মানুষ। তিনি অত্যন্ত সাধারণ অবস্থার থেকে কোর্ট্ অব্ রিকোয়েস্ট্স্-এর কমিশনার, এই সম্মানিত পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর দুটি পুত্রসন্তান যৌবনের প্রারম্ভেই মারা যান। তিন পুত্র, গোবিন্দ, হর এবং গিরিশ জীবিত আছেন। মিস্ তরু দত্তের একজন জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন মিস্ অরু দত্ত। তিনি দুবৎসর আগে মারা গিয়েছেন। এই কবিতাগুলির রচয়িত্রীর মতো তিনিও ছিলেন নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী এবং এ. ডি. বলে স্বাক্ষর করে কখনো কখনো আবেগময় কবিতা ছাপতে পাঠিয়ে আমাদের সম্মানিত করতেন। মিস্ দত্তরা খ্রীষ্টান।'

এরপর কিছুদিনের মধ্যেই আরও সমালোচনা বেরুল। দি ইংলিশম্যান ছন্দমিলের কিছু কিছু ভুল দেখিয়ে মোটামুটিভাবে ভালো বিবরণই একটি দিলেন। এই কাগজটির মতে বইটির সর্বশেষ কবিতা 'আ মঁ পেয়্‌ব্' নামক সনেটটি একবারে নিখুঁত। দি মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড্ তরুকে পুরুষ মানুষ বলে ধরে নিয়েছিলেন। তরু এতে যেমন আমোদ পেয়েছিলেন তেমনি একটু গর্বিতও বোধ করেছিলেন। এই কাগজটির মতে তরু এমন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন যেরকমটি কদাচিৎ দেখা যায়, এবং এঁর দ্বারা অনেক বড় কাজ সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দি ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া মন্তব্য করেছিলেন, 'এই বাঙালী মহিলাটি অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচায়ক ইংরেজী পদ্যছন্দে ফরাসী কবিদের লেখার একটি উৎকৃষ্ট অনুবাদগ্রন্থ আমাদের দিয়েছেন।' দি ইণ্ডিয়ান চ্যারিভ্যারি-র মনে হয়েছিল, তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না যে, এটি এদেশের একজন নেটিভ্-এর কর্ম। তর্জমাগুলি খুবই লাবণ্যমণ্ডিত এবং ফরাসী ও ইংরেজী এই দুটি ভাষাতেই দখল সূচিত করে। ভারতীয়দের কাগজগুলির বেশির ভাগ বইটির প্রশংসা করেন।

ঐ বৎসরের শেষের দিকে এগ্‌জামিনারে এড্‌মণ্ড্ গস্-এর দুই কলাম ব্যাপী

একটি আলোচনা ছাপা হল। 'একটি ভারতীয়া বালিকা' কবিতাগুলিকে মূলের ছন্দ বজায় রেখে অনুবাদ করেছেন দেখে তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন। 'এই আশ্চর্য্য কৃতিত্বের কাজটি যে তিনি সম্পন্ন করেছেন, এটা তাঁর সত্যিকারের বুদ্ধিদীপ্ত একটি সাফল্য।' নির্ভেজাল মূলানুগত্য, তরু এই দুর্লভ সদ্‌গুণটির অধিকারিণী ছিলেন। 'অনুবাদক একজন ইংরেজ হলে তিনি সর্বদা চেষ্টা করবেন, সুষমামণ্ডিত কথাগুলিকেও চেঁছেছুলে একাকার করে দিতে, যদি মূলানুগত অনুবাদে সেগুলিকে বেঢপ শোনায়।' তরু কাব্যমূল্যহ্রাসের সম্ভাবনা মেনে নিয়েও 'যথাযথ অনুবাদ করেছেন।' এই সমালোচনা পাঠ করে তরু খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটি বেশ দরদ দিয়ে লেখা, খোলা-মেলা; আর সেইসঙ্গে একটু মজারও বটে। 'শীফ্ সম্বন্ধে যত লেখা বেরিয়েছে, এটি তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো। সমালোচক যিনিই হোন, তাঁকে আমি আন্তরিকতম ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' শোনা যায় তরু এড্‌মণ্ড্ গস্‌এর সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হন নি। এমন কি, তাঁর সঙ্গে পত্র-ব্যবহারও করেন নি। সাক্ষাতে গস্-এর উপদেশ ও সাহায্য পেলে তাঁর রচনা হয়ত অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতে পারত। ঘষামাজার ফলে সেই অমসৃণতাগুলি থাকত না, একটু আধটু এখানে ওখানে যা চোখে পড়ে। 'কুরিয়ে দ্য ল্যোরপ্' নামক কাগজে শাত্‌লেঁর একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ও 'রেভ্যু দে দ্যো মঁদ্' কাগজে আঁদ্রে তেওরিয়ে-র একটি সমালোচনা ছাপা হয়েছিল পরের বৎসর।

ই. এইচ. টমাস্-এর একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা ছাপা হয়েছিল লণ্ডন কোয়ার্টার্লি রিভিউ-এ। এর সমস্তটা উদ্ধৃত হয়েছিল 'লাইফ এ্যাণ্ড্ লেটার্স্ অব্ তরু ডাট্' বইটিতে সম্পূরক সমালোচনা রূপে। মিস্টার টমাস মন্তব্য করেছিলেন, বইয়ের টীকাগুলিকে আলাদা করে দেখলেও তাদের মধ্যে ফরাসী সাহিত্য বিষয়ে তরুর ব্যাপক বৈদগ্ধ্যের বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়, আর কবিতাগুলিতে আছে অসাধারণ কারিগরী দক্ষতা। তা ছাড়া ব্যক্তিত্বের পরিচয় সম্বলিত অনেকগুলি সুন্দর মৌলিক রচনাও আছে বইটিতে। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই সমালোচককে বলেছিলেন, যে বইয়ের টীকাগুলি তাঁরও বিশেষ করেই চোখে পড়েছে, এবং কবিতাগুলির জন্যে যত না, এই টীকাগুলির জন্যেই বইটির পুনর্মুদ্রণ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। 'একটি ভারতীয়া বালিকার এত অল্পবয়সে ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে এতখানি জ্ঞান থাকাটা একটা অকল্পনীয়

ব্যাপার বলেই মনে হয়। এবং টীকাগুলিতে তাঁর অত্যন্ত দুঃসাহসিক বেপরোয়া মন্তব্যগুলিকেও নির্বোধের উক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শীর্ষস্থানীয় ফরাসী সাহিত্যিকদের নিয়েও তিনি এমনভাবে কথা বলেন, যেন নিজের সমপর্য্যায়ের লেখকদের লেখার মূল্যায়ন করছেন। এর ফলে একদিকে তাঁর জ্ঞানের প্রসার এবং অন্যদিকে তাঁর মতামতের স্বনির্ভরতা ও বলিষ্ঠতা এদের মধ্যে কোন্‌টি যে বেশি প্রশংসার যোগ্য তা ভেবে স্থির করা কঠিন হয়। যদিও এই বিস্ময়কর টীকাগুলিতে বিনম্রস্বভাবা অরুর স্বকীয় অংশের পরিমাণ যে নিতান্তই অল্প তা সকলেই জানেন, তবু এই ভারতীয়া বালিকা দুটির সম্বন্ধেই বলতে হয়, এঁরা যা ভেবেছেন, তার সমস্তই এমন নিখুঁতভাবে এবং এমন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে মানুষকে শ্রদ্ধা সহকারে তাতে মনঃসংযোগ করতে বাধ্য হতে হয়।"[২৮] তাঁর বিবেচনায় শীফ্‌এর সবচেয়ে ভালো কবিতার কয়েকটি অরুর রচনা।

এড্‌মণ্ড্ গস্ মন্তব্য করেছিলেন যে, টীকাগুলি মানুষের মনে জিজ্ঞাসা জাগায় এবং তারপর তার চিন্তাধারার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি ধরিয়ে দেয়। 'কয়েকটি বিষয়ে লেখিকা তাঁর জ্ঞানের অভাবের পরিচয় যেভাবে দিয়েছেন তার চেয়ে অকপট কিছু হতে পারে না, আবার অন্য কতগুলি বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য এত চমকপ্রদ যে তারও তুলনা নেই। সব জড়িয়ে বইটিতে যে কৃতিত্বের পরিচয় আমরা পাই তা বিস্ময়ে আমাদের অভিভূত করে দেয়।'[২৯]

তরু আধুনিকদের নিয়েই তদ্গত-চিত্ত হয়ে থাকতেন, প্রাচীন কবিদের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। গস্ বলেছিলেন, তরুকে নিয়ে যেখানে কথা সেখানে এই প্রাচীন কবিরা কোনও কালে ছিলেন কিংবা ছিলেনই না সেটা যেন অবান্তর। "তাঁর কাছে সময়ের বিচারে দ্যু ব্যার্ত্যার পরেই আসেন আঁদ্রে শেনিয়ে। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর গবেষণায় যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা মিস্টার সেণ্ট্‌স্‌ব্যারি বা 'ল্য দ্যু আসেয়িনো'র পক্ষেও অমর্য্যাদাকর হত না। বোদ্‌লেয়র্-এর মধ্যে 'কুম্ভিলকবৃত্তি'র নিদর্শন খুঁজবার জন্যে ন্যাপল্ ল্য পিয়েনেয়ঁ। সম্বন্ধে তাঁর মতামত জাহির করতে তাঁর আটকায় না। তাঁর ধারণা ছিল আলেক্‌জাণ্ডার স্মিথ জীবিত আছেন ; এবং সেঁৎ ব্যভ্- এর কর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অদ্ভুত রকমের অস্পষ্ট।"[৩০]

শীফ্-এর প্রথম কবিতাটির মূল লেখক ল্যকঁৎ দ্য লীল্ সম্বন্ধে তরু

বেঙ্গল ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ছোট্ট মানুষটির মতন করে হলেও একটা জায়গায় তরুর বেশ অনেকখানিই মিল ছিল ল্যকঁৎ দ্য লীল্‌-এর সঙ্গে। তাঁরই মতন করে তরুর মনটাকেও মহত্তমের সন্ধান ও অসীমতার উপলব্ধির আগ্রহ পেয়ে বসেছিল। মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মধ্যেই মুক্তি, এমন কি মৃত্যুতেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা, দুজনেরই ছিল এই মনোভাব। সূর্য্যকে আহ্বান করে এই ফরাসী কবিটি লিখেছেন ঃ

তোমার মহিমা যেন পরিচ্ছন্ন রক্তস্রোত সম
ক্ষতমুখ হতে ঝরে।
আসিলে মরণ
তুমি তারে হাসিমুখে করিও বরণ,
কেননা লভিবে তুমি নূতন জনম তারপরে।

ভিক্টোরীয় যুগের অন্য অনেক লেখক-লেখিকার মতো তরুও মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস করতেন, এবং সেই বিশ্বাসই ছিল মৃত্যুর কাছে তাঁর আত্ম-সমর্পণের মূলে। শার্লট্ ব্রণ্টে এতবার করে ভগবানের ইচ্ছার কাছে নিজেকে নিবেদন করে দেওয়ার কথা বলেছেন যে তা ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। সে যুগটাকে বলা হত স্ট্রেট্ লেস্ড্ অর্থাৎ আঁটো করে ফিতা বাঁধা, কারণ, ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে অনেক কড়াকড়ি নিয়মের ব্যবস্থা ছিল সে যুগে। ব্যবহারবিধির সেই কড়াকড়ির যুগেও কী বাস্তবে কী গল্প-উপন্যাসে যেসব শোচনীয় ঘটনা প্রায়শঃই ঘটত, তাদের মধ্যে সর্বদাই একটি মধুর স্বাদের প্রায় নাটকীয় আত্মবিলুপ্তির পরিচয় থাকত।

কঁৎ দ্য গ্র্যামঁ থেকে অনুবাদ করার সময় তরুর মনে হয়েছিল তখনকার দিনের 'আধুনিক' ফরাসী কবিদের মধ্যে ঐ কবিটি সর্বাগ্রগণ্য। ইনি ইটালীয় ভাষাতেও অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তরুর মৃত্যুর পর তাঁর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই কবিটির কতগুলি বাছাই করা সনেটের অপ্রকাশিত অনুবাদ পাওয়া গিয়েছিল।

ভিক্তর য়ুগো ছিলেন তরুর একজন প্রিয় লেখক। তরুর মতে তিনি ছিলেন তখনকার পৃথিবীর সমস্ত জীবিত কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মেরীকে লেখা একটি চিঠিতে তরু বলেছিলেন, 'কখনো কখনো ভিক্তর য়ুগো কতকটা

দুর্বোধ্য হয়ে যান। লিত্‌র্‌-এর অভিধান না দেখলে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ-গুলির অর্থ বোঝা কঠিন হয়, কিন্তু যে ফরাসী ভাষা তিনি ব্যবহার করেন তা সত্যিই খুব ভালো।'

স্থলারি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তরু বলেছেন, ইনি যা পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চান তা অতি যত্নে বিশদভাবে বর্ণনা করেন। এঁর লেখার প্রতিটি অংশেই পল্লীজীবনের কিছু ছবি, কিংবা নিখুঁত সুন্দর চমকপ্রদ কোনো ছোটখাট ঘটনা থাকে। 'স্থলারিকে যোগ্যতার যথাযথ বিচারেই ফ্রান্সের পেট্রার্ক্‌ বলা হয়েছে।'

যে কবিদের কবিতা তরু অনুবাদ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের অন্তরঙ্গ পরিচয় একটু একটু তরু দিয়েছেন তাঁর নোটগুলিতে। বেরাঁজে-র 'উপজীবিকা' কবিতাটি যে থ্যাকারের খুব প্রিয় ছিল এই ধরনের খুঁটিনাটি, যেগুলির বিশেষ গুরুত্ব নেই, সেগুলিও যে কী করে তাঁর গোচরে এসেছিল তা ভাবলে খুবই অবাক্‌ হতে হয়। 'শার্ল্‌ নদিয়ে-র ক্ষমতার পরিচয় তাঁর কবিতার চেয়েও তাঁর গদ্য রচনায় বেশি মেলে। এঁর গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক এবং খুব বেশি ওয়াশিংটন আর্ভিংকে মনে পড়িয়ে দেয়। অ্যালেক্‌সাঁদ্‌র্‌ দ্যুম্যা, যিনি এঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, এঁর জীবন এবং কার্য্যাবলীর একটি প্রাণবন্ত আলেখ্য দিয়ে গিয়েছেন। নদিয়ে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণে এসে-ছিলেন এবং ওয়াল্টার স্কট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে তাঁকে উদ্দেশ করে লেখা এঁর কয়েকটি কবিতা ব্ল্যাক্‌উড্‌স্‌ ম্যাগাজিনের গোড়ার দিক্‌কার সংখ্যাগুলিতে দেখতে পাওয়া যাবে।'

আঁদ্রে লেময়ান্‌ বেশি লেখেননি, কিন্তু তাঁর যৎসামান্য লেখা যা প্রকাশিত হয়েছে তা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। পিয়ের্‌ দ্যুপঁ ছিলেন, 'দরিদ্রদের সুখ-দুঃখের কবি'। নিকলাস্‌ মার্তঁ্যা-কে জার্মানির মহান্‌ কাব্যসাহিত্য অভিভূত করে রেখেছিল। তিনি বন্‌-এ জন্মেছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন জার্মান, যাঁর ভাই ছিলেন কার্ল্‌ সিম্‌রক। কার্ল্‌ সিম্‌রক প্রাচীন ঐশ্বর্য্যময় 'নিবেলুঙ্গেন' নামক মহাকাব্যটিকে আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। এটিকে ভিক্তর য়ুগো পৃথিবীর তিনটি সর্বোত্তম মহাকাব্যের একটি বলে মনে করতেন। তরু অত্যন্ত গর্ব করে বলতেন যে য়ুগোর এই অন্য দুটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের একটি রামায়ণ, অপরটি মহাভারত !

'একটি অবিবাহিতা বালিকার মৃত্যু' শীর্ষক দ্য প্যার্নির একটি কবিতার অনুবাদ সম্ভবতঃ তরুর সবচেয়ে সুন্দর অনুবাদগুলির অন্যতম। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তাঁর ভগ্নীবিয়োগ-জনিত ব্যথা এর সঙ্গে মিশে যাওয়াতেই কবিতাটি এত সুন্দর হয়েছিল।

বালিকার মতো আচরণ তার
কবে যে হয়েছে গত,
কোনও বালিকা নিষ্পাপ তবু
হয় না ত তার মতো।

প্রতিটি অঙ্গে লাবণ্য তার
জ্বলত দীপ্তি পেয়ে ;
প্রেমের স্বপ্ন দেখল না তবু
অনূঢ়া সেই মেয়ে।

আর ক'টি মাস, বুঝি ক'টি দিন
সুখে কেটে যাবে যবে,
ভাবছি আমরা প্রেমের কুসুম
বুঝি বিকশিত হবে ;
মধুমাস এলে যেই মতো তার
আলোকের সমাদরে
গোলাপ, নিপুণ কারুকাজ করা
ফুলগুলি তুলে ধরে।

কিন্তু ভিন্ন ধারার বিধান
ছিল বিধাতার মনে,
তাই মহাঘুম ধীরে ধীরে তার
নেমে এল দুনয়নে।

দুলালী সে ছিল ঐ আকাশের
তারায় তারায় ভরা।

এতখানি রূপ ধরে বেশিদিন
রাখবে কী করে ধরা ?
নব-যৌবনা নারীর জীবন
সূচনাতে হ'ল শেষ ;
গেল সে, যেমন পাতা-ভরা বনে
না রেখে চিহ্নলেশ
পাখীর গলার গান মরে যায়,
গলে মরে যায় মুখে,
মধুর হাসিটি ফুটে একবার
শুধু ক্ষণিকের সুখে।

লামার্তিন সম্বন্ধে তরু লিখেছেন, 'কল্পনাবিলাসে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, রচনাশৈলীতে, একমাত্র রুচির পরিচ্ছন্নতা ভিন্ন অন্য সব কিছুতে, যা কিছু দিয়ে কবির কবিত্বের পরিচয়, ভিক্তর য়ুগোর কাছে তাঁকে নতি স্বীকার করতেই হয়।' এরপর আসছে তরুর সমালোচনা : 'ভিক্তর য়ুগো যদিও অনেক বড় কবি,—কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা নীতিবোধ যথেষ্ট সুগঠিত হয় নি এমন তরুণ-বয়স্কদের হাতে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ হয় না। কিন্তু লামার্তিন নির্বিচারে সকলেরই হাতে দেওয়া যায়।' পাঠযোগ্যতার বিচার করতে বসে তরু যদি ভিক্টোরীয় যুগের রুচির পরিচয়ই না দিলেন তাহলে আর তিনি করলেন কী ? তরুর সমালোচনাগুলিতে পিউরিটানদের মনোভাবের পরিচয় কিঞ্চিৎ লক্ষ করা যায়, আর তাঁর নিজের লেখায় স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিকে অবদমিত করে রাখবার প্রয়াসেরও যেন লক্ষণ চোখে পড়ে। তবু জেন্ অস্টেন্ বা শার্লট্ ব্রণ্টের বিচার আমরা যেভাবে করে থাকি, তরুকেও তাঁর সুনীতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সেইভাবে বিচার করে আমাদের খুশিই হওয়া উচিত। কারণ আর কোনও ধরনের গদ্য বা পদ্য রচনাতেই তরুর হাত এত ভালো খুলত না, তাঁর মধ্যে সবচেয়ে যা পাবার মতো তা আমরা পেতাম না। এবং এই জন্যেই তিনি যখন বলেন, লে মিজেরাব্‌ল্‌-এ কতকগুলি অশ্লীল জায়গা আছে,… যেমন প্রায় সমস্ত ফরাসী বইয়েই থাকে', তখন তাঁর এই প্রাচীনপন্থী নৈতিক মূল্যায়নকে

ক্ষমার চোখেই দেখা উচিত। স্যেঁৎ ব্যভ্ সম্বন্ধে তরু বলেন, তিনি যদিও 'ফ্রান্সের সাহিত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সমালোচকদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের একজন' কিন্তু প্রথম সারির কবি তিনি নন। 'তার মানে এ নয় যে তিনি নীচুদরের কিংবা মাঝামাঝি রকমের কবি। প্রথম সারির যদিও তিনি নন, এবং য়ুগো লামার্তিন্দের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা তাঁর নেই, দ্বিতীয় সারির শুরুর দিকেই তাঁর স্থান।'

তরুর চল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী টীকাগুলির কথা বলা হল। এগুলিতে তৃপ্তিকর নূতনত্বের স্বাদ, স্পষ্টবাদিতা, সারল্য এবং দোষগুণ বিচারের ক্ষমতা এতটাই আছে যে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত না পড়ে বইটিকে হাতছাড়া করা যায় না। অ্যালফ্রেদ্ দ্য ম্যুসের মধ্যে আছে 'উদ্দীপনা, শক্তিমত্তা, বুদ্ধির দীপ্তি এবং প্রকৃতিপ্রীতি, তা কখনো অকৃত্রিম আর কখনো বা লোকদেখানো।' বায়রনের মতো তিনি কখনো কখনো উদ্ভট এবং উদ্দাম। 'যে সব কবিরা উনবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বেশি লিখে গেছেন এবং সবচেয়ে বেশি অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়ে গেছেন' জুল্ ল্যফেভ্র্ দ্যোমিএ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। 'তিনি ছিলেন সেই বীর যোদ্ধদলের একজন সহযোগী যোদ্ধা এবং বন্ধু যাঁদের মধ্যে ছিলেন ভ্য ভিন্যী, লামার্তিন্, ভিক্তর য়ুগো এবং আরও কয়েকজন যাঁরা অনেক বীরোচিত সংগ্রামের পর কবিতা বিষয়ে এক নূতনতম মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, যে মতবাদ অনুসরণকারী কবিগোষ্ঠীর স্থান বর্তমানে ফ্রান্সে সকলের উপরে বলে স্বীকৃত।'

তরু যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ফরাসী বিপ্লবের যুগের কবিদের কাব্য খুব মন দিয়ে পড়তেন। রোম্যান্টিকদের প্রতিই ছিল তাঁর বিশেষ পক্ষপাত এবং তাঁদের অবাধ কল্পনার জগতে বিচরণ ও ব্যক্তিহিসাবে মানুষের ন্যায়সঙ্গত যাবতীয় অধিকার লাভে বিশ্বাস তাঁর খুব ভালো লাগত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্যের গঠন ও অন্যান্য নিয়ম সংক্রান্ত যেসব কড়াকড়ি ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে সেগুলি ছিল না। তরু মনে করতেন, প্রাচীন আদর্শ অনুসরণে বিশ্বাসী ক্লাসিসিজ্‌ম্ নামে পরিচিত সপ্তদশ শতাব্দীর রচনারীতি গ্রীস্ ও রোমের কাছে নির্বিচার বশ্যতা স্বীকার করে চলত। রোম্যান্টিকরা ছিলেন আড়ম্বরবর্জ্জিত, দ্ব্যর্থহীন এবং সুস্পষ্ট। কিন্তু ফরাসী র‍্যনেয়্সাঁস্ যুগের কবিদের তরু বর্জন করেননি। শেনিয়ে, কুরিয়ে,

বেরাঁজে এবং লামার্তিন্ থেকে তাঁর জানবার আগ্রহ তাঁকে আরও পশ্চাতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্যার্নি ও দ্য ফ্লরিয়াঁ, কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীতে কর্নেয়্ এবং স্ক্যারঁ, এমনকি আরও পশ্চাতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। এঁদের সূত্র ধরেই এলেন আধুনিক কবিরা। শীফ্-এ যুগোকে সবচেয়ে বেশি মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে ; তাঁর ত্রিশটি কবিতার অনুবাদ রয়েছে বইটিতে। তারপর যাঁরা বেশি সমাদর পেয়েছেন তাঁরা হলেন ম্যুসে, কঁৎ দ্য গ্র্যামঁ এবং জোসেফ্যাঁ স্যুলারি।

বহু বৎসর আগেকার দিনগুলির দিকে তাকিয়ে এবং তরুর শীফ্-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এই কথাটা কেবলই মনে হয়, এক শ বৎসর আগে তরুর অনুবাদ করা এবং নিজের রচনা কবিতাগুলি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা আজকের দিনে সম্ভব হত কি না। এটা ভাবতে ভালো লাগে যে ভিক্টোরিয়ার যুগের কঠোর নীতি-পরায়ণ এই অল্পবয়স্কা বালিকা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার সমস্ত রকম প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তখনকার দিনের আত্মদমনের সকল প্রবণতা যেন কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন ; এবং এলিয়টের পরবর্তী যুগের এখনকার সবরকম আন্দোলনেরই পুরোভাগে থেকে, এগিয়ে চলার ধাতের কবিতার বাগ্‌বাহুল্যের দিনেও, তাঁর কবিতা পাঠ করে লোকে আনন্দ পাচ্ছে। তাঁর সেকেলে ধরনের ছন্দমিল, তাঁর অপ্রচলিত প্রথার যতিচিহ্নের ব্যবহার, যা এক-একসময়ে অর্থবিভ্রাট ঘটায়, সুপ্রাচীন কালের রীতিনীতির প্রতি তাঁর পক্ষপাত, মানবাত্মা ও ভগবান্‌কে কবিতার মূল বিষয়বস্তু করা বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা,—এগুলিকে যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে তিনি এ যুগের কবিতার জগতে প্রায় স্বচ্ছন্দেই নিজের স্থান করে নিতে পারতেন। কারণ তিনি অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাক্ষাৎভাবে সত্যের মোকাবিলা করেছেন, যা সব যুগে সব কবিরাই করে থাকেন, এবং সেই হেতু তিনি বেঁচেও থাকবেন। শ্রুতিসুখকর শব্দঝঙ্কার এবং মিষ্টি ধরনের গীতি-কবিতায় মনোনিবেশ করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, যা সম্ভবতঃ অন্য একজন খ্যাতিমতী ইঙ্গো-ইংলিশ নারী কবি সরোজিনী নাইডুর রচনাশৈলীর ছিল বড় পরিচয়।

তরুর ক্ষীণকায় কবিতাগুলি ছন্দশাস্ত্রের নিয়মকানুন্ সব সময় মানত না, কিন্তু রচনাশৈলীর দিক্ দিয়ে ছিল প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের আদর্শ অনুসারী, তাছাড়া শব্দসমৃদ্ধ, মধুনিঃস্যন্দী। আমরা ঐ চিন্তা এড়াতে পারি না যে, তরু

এখনকার দিনে বেঁচে থাকলেও কবিতা লিখতেন। তা না হলে কেন প্যারনেসিয়াঁ বোদলেয়র, স্যাঁৎ ব্যভ্ প্রভৃতির কবিতা তাঁকে এত মুগ্ধ করত? অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। তাঁর মধ্যে এমন একটি মানসিকতা ছিল যা ছিল ঐ কবিগোষ্ঠীর মানসিকতার সমধর্মী, এবং সেই একই কারণে টি. এস্. এলিয়টের জগতেও স্থান করে নিয়ে তিনি থাকতেন। কিন্তু আজকের দিনের পার্মিসিভ সোসাইটির অর্থাৎ মানুষের সমস্ত রকম সামাজিক আচরণ অনুমোদন করার মনোভাবসম্পন্ন যে লেখকগোষ্ঠী, তার অন্তর্ভুক্ত তিনি কখনোই হতেন না।

শীফ্-এর নোটগুলির মধ্যে যেটি অরুর সম্বন্ধে লেখা সেটি অত্যন্তই মর্মস্পর্শী। তরু লিখেছেন, 'যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাঁর সহযোগিতায় বইটি অপেক্ষাকৃত ভালো হতে পারত এবং এই লেখিকার এটিকে নিয়ে লজ্জিত হবার কারণ কম ঘটত, আর সেজন্যে পাঠকদের প্রশ্রয়ের উপর এত বেশি তাঁকে নির্ভর করতেও হত না। কিন্তু হায়!'

উপন্যাস

তরুর মৃত্যুর পর তাঁর অন্য কিছু কিছু অপ্রকাশিত রচনার সঙ্গে গোবিন চন্দর ফরাসী ভাষায় লিখিত একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান, এবং ১৮৭৮ সালের অগস্ট মাসে সেটি ক্ল্যারিস্ ব্যাদেকে পাঠিয়ে দেন। এই ফরাসী লেখিকা তাঁর স্মৃতিচারণে পরবর্তীকালে লিখেছেন, "বৃদ্ধের নিজের হাতে আগা-গোড়া নকল করা সেই পাণ্ডুলিপিটি আমি যে নিরাবেগ মন নিয়ে হাতে করেছিলাম তা নয়। বৃদ্ধ লিখেছিলেন, 'আমার হাত কেঁপে কেঁপে যায় এবং আমাকে আস্তে আস্তে নকল করতে হয়,' কিন্তু সুন্দর জোরালো হস্তাক্ষরগুলিতে কাঁপা হাতের লক্ষণ কিছুই ছিল না। এই তিক্ত মধুর কাজটি তিনি সম্পন্ন করতে পেরে-ছিলেন এরই সৃষ্টি করা মোহময়তার থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। তিনি লিখেছিলেন, 'আমি যতক্ষণ লিখি ততক্ষণ আমার মনোভাব এইরকম থাকে, যেন আমি তার সঙ্গে কথা বলছি'।"

'ল্য জুর্ন্যাল্ দ্য মাদ্‌মআজেল্ দ্যার্‌ভেয়্‌র্' নামক এই উপন্যাসটির ভূমিকা লিখেছিলেন ক্ল্যারিস্, এবং ফরাসীতে বইটি প্রকাশের ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করেছিলেন।[৩১] এই সুহৃদ্‌টি, তরু যাঁকে চোখে দেখে যেতে পারেন নি, তাঁর লেখা প্রীতিপূর্ণ স্মৃতিকথা এই অল্পবয়স্কা বালিকার প্রতি সপ্রশংস শ্রদ্ধা ও বেদনায় পরিপূর্ণ। তরু সম্বন্ধে ক্ল্যারিস্ লিখেছেন, 'তিনি কেবল যে অনুবাদই করেছেন তা নয়, তিনি নিজেই ফরাসী ভাষার একজন লেখিকা হতে চেয়েছিলেন, এবং ফরাসীতে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন যেটি আজ আমাদের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। তরুর ভালোবাসা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি ফ্রান্স দেশটাকেও ভালোবাসতেন, যে ভালো-বাসার পরিচয় ফ্রান্সের নিদারুণ দুঃখের দিনে তিনি দিয়েছিলেন।'

ফরাসী উপন্যাসটিতে তরু উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের ফরাসী সমাজের চিত্র বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন এবং এই চেষ্টা চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে এইজন্যে যে, লেখিকার মানসিকতা ও বৈদগ্ধ্য বিস্ময়করভাবে এর মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একজন ওলন্দাজ সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, 'বইটিতে এমন কিছু নেই যার থেকে মনে হতে পারে যে লেখিকা একজন

বিদেশিনী।' তরুর জীবনীকার হরিহর দাসের ভাষা আরও আবেগময়: 'আমরা জানতে চাই, সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসে এমন আর একটিও দৃষ্টান্ত আছে কি না, যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে কেউ একটি বৈদেশিক ভাষা এমন পূরোপূরি আয়ত্ত করেছে যার ফলে সেই ভাষায় তার পক্ষে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে, যে গ্রন্থের রচনাশৈলী এমন নিখুঁত সুন্দর।'

একটি ফরাসী ক্যাথলিক মেয়ের দিনলিপি থেকে আংশিক উদ্ধৃতি রূপে উপন্যাসটি কল্পিত। নায়িকা ম্যার্গ্যেরিত্ কন্‌ভেণ্ট্ ছেড়ে বেরুবার পর থেকে তাঁর অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত দেড় বৎসর এই দিনলিপির ব্যাপ্তিকাল। নায়িকার অসুস্থতা ও মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে বইটির উপসংহারে। বইটি শুরু হয়েছে একটি অল্পবয়স্কা মেয়ের মিষ্টি মিষ্টি ছেলেমানুষি কথা দিয়ে। দুঃখের ছায়া মাত্র পড়েনি এমন সাধারণ ছোটখাট রকমের সব আনন্দ দিয়ে মেয়েটির মন ভরপুর। একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতির তিনি একমাত্র সন্তান। সেনাপতি সস্ত্রীক ব্রিটানিতে বাস করেন। নায়িকা তাঁর পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃপূর্তি উদ্‌যাপন করতে বাড়ী আসেন, এবং সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি পার্টিতে একজন বিধবা কাউণ্টেস ও তাঁর দুই পুত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

এরই তিন দিন পরে লুই ল্যফেভ্‌র্ নামের একজন অল্পবয়স্ক পদস্থ সৈনিক কর্মচারী তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে তাঁদের বাড়ীতে আসেন। ম্যার্গ্যেরিতের মা-বাবার ইচ্ছা তিনি ল্যফেভ্‌র্‌কে বিবাহ করেন, কিন্তু ম্যার্গ্যেরিত্ রাজী হন না, কারণ ইতিমধ্যে তিনি কাউণ্ট্ দুনআকে ভালোবেসে ফেলেছেন এবং দুনআর মা কাউণ্টেস তাঁদের বিবাহে মত দিয়েছেন। এদিকে দুনআ এবং তাঁর ছোট ভাই গ্যাস্‌তঁ দুজনেই তাঁদের পরিচারিকা জ্যানেত্ নামের একটি পল্লী-বালিকাকে আগে থেকে ভালোবাসেন। এই পরিচারিকাটিকে ম্যার্গ্যেরিত্‌ই কিছুদিন আগে কাউণ্টেসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঈর্ষ্যায় ক্ষণিকের জন্যে দিশাহারা হয়ে দুনআ তাঁর ভাইকে মেরে ফেলেন, এবং তাঁকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি আত্মহত্যা করেন এবং কাউণ্টেস্ পাগল হয়ে যান।

ম্যার্গ্যেরিত্ এরপর গুরুতর রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং কিছুকাল পরে তাঁর পিতামাতাকে খুশি করবার জন্যে লুইকে বিবাহ করেন। অকারণেই তাঁর মনে হতে থাকে তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না, কিন্তু তিনি ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেন।

ক্রমে লুইকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতে আরম্ভ করেন এবং অল্প কিছুকাল তাঁরা নিস্-এ সুখে বসবাস করেন। আসন্নপ্রসবা ম্যার্গ্যেরিত্ পিত্রালয়ে ফিরে আসেন এবং একটি পুত্রসন্তান রেখে মারা যান।

গল্পটি মর্মান্তিক কিন্তু ভয়াবহ নয়। অস্বস্তিকর কোনো ব্যাপারের খুঁটিনাটি বর্ণনাও এতে নেই। যদিও ধরনটা একটু অতিরিক্ত নাটকীয়, কিন্তু একটি উচ্চ পর্য্যায়ের মনোভাব সমগ্র উপন্যাসটিতে পরিব্যাপ্ত। অল্প যে-কয়টি মানুষকে নিয়ে গল্প তাঁদের চরিত্রগুলি চিত্রিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। ম্যার্গ্যেরিত্ তাঁর বয়সের পক্ষে সামান্য একটু বেশি পরিপক্ক এবং হয়ত ঠিক বাস্তবানুগ নয়। তাঁর ভগবানের উপর নির্ভর, তিনি যেরকম দেখতে, যেরকম পরিবেশে তিনি মানুষ, এছাড়া আরও অনেক খুঁটিনাটিই বাইরের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত হৃদয়জ ভাবের সৃষ্টি, এবং মনে হতে পারে এগুলি তরুর নিজেরই দেওয়া নিজের বর্ণনা। ম্যার্গ্যেরিতের ভগিনী ভেরনিকাকে সহজেই অরুর প্রতিকৃতি বলে মনে হতে পারে। অবশ্য এই কারণেই উপন্যাসটি প্রত্যয়যোগ্য হয়ে উঠেছে এবং পাঠকের কৌতূহল শিথিল হতে দেয় না। সমালোচনাগুলি ভালো হয়েছিল। আদ্রিয়ঁা দেস্প্রের মনে হয়েছিল বইটিতে 'লেখিকা একটি অল্পবয়স্কা স্নেহপ্রবণা বালিকার অন্তরের সমস্ত সম্পদ্ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন।' গ্যারশ্যঁা দ্য ত্যাসি,[৩২] ক্ল্যারিস্ যাঁকে তরুর পরিচয় দিয়েছিলেন, এবং তরুর সম্বন্ধে উচ্চধারণাজনিত শ্রদ্ধা যাঁর ছিল গভীর, তিনিও তরুর এই বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

বাংলাভাষায় এই উপন্যাসটির দুটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে—একটি অনুবাদ রাজকুমার মুখার্জির করা, অন্যটি পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের। 'কবি তরু দত্ত' [৩৩] বইটিতে তরু এবং তাঁর উপন্যাসটি সম্বন্ধে রাজকুমার মুখার্জির মন্তব্যগুলি পড়বার মতন। তাঁর ধারণা, তরুর রচনার ধরনটা আসলে ভারতীয়। এইজন্যেই, নিজের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতেন বলে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ দুদেশেই তিনি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এটা বিস্ময়ের বিষয় যে, যদিও সে সময়ে ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে ইংরেজীতে লিখতে আরম্ভ করে-ছিলেন, এই উপন্যাসটি ফরাসীতে রচিত, এবং লেখিকা একটি বাঙালী তরুণী। তিনি মনে করেন, যেহেতু প্লটটি গতানুগতিক নয়, তরু, মনে হয়, অনুরূপ চরিত্রের কিছু মানুষ দেখেছিলেন, যাদের ঘিরে তাঁর গল্প তিনি গড়ে তুলেছেন। এর

সবটাই নিছক কল্পনা হতে পারে না। জেম্‌স্‌ ডার্‌ম্‌স্টেটরের মতে, তরুর বর্ণিত ঘটনাগুলি সত্যসত্যই ইংলণ্ডের একটি পরিবারে ঘটেছিল। দুটি ভাই একটিই মেয়েকে ভালোবেসেছিল এবং ঈর্ষ্যাবশে একজন অপরজনকে হত্যা করেছিল। কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনাটি বাস্তবিক যে কখন ঘটেছিল তা জানা যায় না, এবং রাজকুমার মুখার্জি বিশেষ করে এটা উল্লেখ করেছেন যে, তরু সে-সময় ইংলণ্ডে ছিলেন কি না ডার্‌ম্‌স্টেটর তা বলেন নি। এটাও স্পষ্ট করে বোঝা যায় না, তরু ইংলণ্ডে থাকতেই বইটি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন কি না। সে-সময় স্থির হয়েছিল, এক বোন বইটি লিখবেন এবং অন্য বোন সেটিকে চিত্রালঙ্কৃত করবেন। কিন্তু অরুর আঁকা ছবি একটিও পাওয়া যায়নি বলে এটাই মনে হয় যে, তরু বইটি লিখেছিলেন অরুর মৃত্যুর পর। রাজকুমার মুখার্জি মনে করেন যে ইংলণ্ডে থাকতে ফরাসী ভাষায় তরুর দখল এতটা নিখুঁত হওয়াও সম্ভব ছিল না। তবে এ-বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না, কেননা তরু সে-সময়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ফরাসী ভাষা শিখছিলেন। ডার্‌ম্‌স্টেটরের মতে তরু উপন্যাসটি লিখেছিলেন তাঁর আঠারো বৎসর বয়সে, ১৮৭৪ সালে, যে বৎসর তাঁর বোন মারা যান। আশ্চর্য্যের বিষয় যে মেরীকে লেখা তাঁর কোনো চিঠিতে তরু তাঁর এই উপন্যাসটির উল্লেখ করেননি। মেরীর মুখে শোনা গল্পের কোনো একটি থেকে প্লটটির মোটামুটি একটা কাঠামো তরুর মনে এসে থাকতে পারে। সুন্দ ও উপসুন্দ নামের অসুরদের যে দুই ভাই তিলোত্তমাকে ভালোবেসে যুদ্ধে পরস্পরকে হত্যা করেছিল, সেই কাহিনী থেকেও উপন্যাসটির উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে বলে রাজকুমার মুখার্জি মন্তব্য করেছেন।

অকালমৃত্যুর চিন্তা তরুর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। হয়ত সেইজন্যেই তিনি লুকিয়ে এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন, কারণ নিজেদের পরিবারের নিদারুণ দুর্বিপাকে পড়া নিয়ে প্রকাশ্যে শোক করা তাঁর ভালো লাগত না। কিন্তু ম্যার্গ্যেরিতের মধ্যে দিয়ে তাঁর চেপে রাখা মনোবেদনা খানিকটা প্রকাশের পথ পেয়েছিল। গল্পের প্লটের উৎস নিয়ে চিন্তা বা এর রোমাঞ্চকর নাটকীয়তা পাঠকের মনে যতটা প্রভাব বিস্তার করে, তার চেয়ে বেশি করে ম্যার্গ্যেরিত্‌ চরিত্রের ক্রমপরিণতি এবং তাঁর অকাল মৃত্যু। এর মধ্যে রয়েছে তরুর নিজেরই নিয়তির পূর্বাভাস; কারণ, বইটি প্রকাশিত হয়েছিল তরুর মৃত্যুর পর, যখন পৃথিবীর লোক তাঁর অতি অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগের কথা জেনে গিয়েছে।

ম্যার্গ্যেরিতের মনে মাতৃত্বের জন্যে যে আকুল আকূতি, তার মধ্যে দিয়ে হয়ত সুস্থ সবল দেহ, দীর্ঘজীবন লাভ, বিবাহ ও সন্তানের জননী হওয়ার জন্যে তরুর নিজেরই মনের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। যদিও তিনি কখনও কাউকে ভালোবেসেছিলেন বা বিবাহের কথা চিন্তা করেছিলেন বলে জানা যায় না, কিন্তু অন্য সমস্ত স্বাভাবিক নারীর মতো তিনিও গোপন মনে স্বামী ও সন্তানের ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই পোষণ করতেন।

জেম্‌স্ ডারমস্টেটর এবং এড্‌মণ্ড্ গস্ দুজনেই তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ নারী ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তরুর তুলনা করেছেন। মিসেস্ গ্যাস্‌কেল্-এর লেখা শার্লট্ ব্রণ্টের জীবনী পাঠ করে ব্রণ্টেদের দুঃখময় ইতিহাস জেনে তরু অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। মেরীকে তিনি লিখেছিলেন, 'ভাবতে কী রকম লাগে যে ইয়র্ক্‌শায়ারের জনশূন্য, বিস্তীর্ণ বন্য প্রান্তরের মাঝখানে ধর্মযাজকদের জন্যে তৈরি একটি পুরনো বাড়ীতে ঐ তিনটি অল্পবয়স্কা ভগিনী—তিনজনই তাঁরা ধীশক্তির অধিকারিণী, অথচ ইয়র্ক্‌শায়ারের বিরাট এক পোড়োজমির অঞ্চলে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন।' শার্লটের দুজন বড় বোন ইতিমধ্যেই যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ম্যার্‌গ্যেরিতের চরিত্র ব্রণ্টে ভগিনীদের সঙ্গেও কী রকম মিলে যায়। তরুর বইয়ে সমস্ত ভিক্টোরীয় যুগের আদর্শ-চরিত্র নারীদের অমায়িক ধরনধারণ এবং অদৃষ্টনির্ভর মনোভাবের পরিচয় রয়েছে। জেন্ এয়্যার, অথবা ভিয়েৎ-এর ল্যুসী স্বচ্ছন্দে তরুর সৃষ্ট চরিত্র হতে পারত। যদিও তিনি ফরাসী ভাষায় তাঁর উপন্যাসটি লিখেছিলেন, তবু তাঁর রচনা-রীতির সঙ্গে জেন্ অস্টেন্ এবং জর্জ্ এলিয়টের রচনারীতির যে মিল আছে তাতে কোনো ভুল নেই। নিজের জীবনের দুঃখময় অবসানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাস দিয়েই যেন তিনি ব্রণ্টেদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'কী দুঃসহ দুঃখময় জীবন এই পিতার, যাঁকে পরপর সব ক'টি সন্তানের মৃত্যু দেখতে হয়েছে, তারপর রোগদুর্বল দেহ নিয়ে ইয়র্ক্‌শায়ারের যাজক-নিবাসে একান্তে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছে।'

তরুর দ্বিতীয় উপন্যাস, 'বিয়াঙ্কা অব্ দি ইয়ং স্প্যানিশ মেয়্‌ডেন্'—বিয়াঙ্কা নাম্নী একটি অনূঢ়া স্প্যানিশ তরুণী—তিনি অসমাপ্ত রেখে গেছেন। তরুর মৃত্যুর পর এর আটটি অধ্যায় গোবিন চন্দর খুঁজে পান, এবং এগুলি ১৮৭৮-এর জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত বেঙ্গল ম্যাগাজিনে[৩৪] ধারাবাহিক-

ভাবে প্রকাশিত হয়। গোবিন চন্দর একটি পাদটীকায় লিখেছেন: 'শান্তস্বভাবা লেখিকার যে হাতটি গল্পটাকে এতদূর অবধি অগ্রসর করে এনেছে,—মিস্ তরু দত্তের হাত—তা এইখানে এসে থেমে গেছে। তাঁর অসুস্থতার জন্যেই কি তাঁর ক্লান্ত অঙ্গুলি থেকে কলম খসে পড়েছিল? আমি জানি না। তবে, আমার তা মনে হয় না। এটা বোধহয় প্রথম উদ্যমের একটা স্কেচ, বিশেষ যত্ন না নিয়ে লেখা একটা কাঠামো খাড়া করা মাত্র, যা তিনি ফেলে দিয়েছিলেন। আমার এইরকম মনে হবার কারণ, ফরাসী ভাষায় যে উপন্যাসটি লিখে রেখে গেছেন সেটি অসম্পূর্ণ লেখাটির তুলনায় অনেক উচ্চস্তরের এবং সেটি তিনি সমাপ্ত করেছেন। এছাড়াও গদ্য পদ্য উভয় রকমের টুকরো টুকরো অসমাপ্ত লেখা তাঁর আরও আছে, তবে সেগুলি বেশির ভাগই একমেটে ধরনের, যেগুলিকে আদৌ ঘষামাজা করা হয়নি।'

জুর্ন্যালের মতো বিয়াঙ্কারও প্লটটি বিয়োগান্ত। এটি ইংরেজীতে লেখা। ইংলণ্ডে একটি গ্রামে এসে বসবাসকারিণী একজন স্পেনদেশীয় ভদ্রমহিলার কয়েকটি সন্তান বিয়োগের পর সর্বকনিষ্ঠ একমাত্র জীবিত সন্তান বিয়াঙ্কা গার্সিয়া। বিয়াঙ্কার বড় বোন ইনেজ্-এর মৃত্যু এবং ফেব্রুয়ারী মাসের এক শীতের দিনে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে গল্পের শুরু। এই মৃত্যুতে বিয়াঙ্কা ও তাঁর পিতা শোকার্ত। দুঃখে বিয়াঙ্কা অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তাঁর স্কচ পরিচারিকা মার্থা তাঁকে এই বিয়োগ-বেদনা চেষ্টা করে ভুলতে অনুরোধ করে। এক বৎসর পর, বিয়াঙ্কার পরলোকগতা ভগিনীর সঙ্গে যাঁর বিবাহ হবার কথা ছিল, মিস্টার ইংগ্রাম বিয়াঙ্কাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে বিয়াঙ্কার পিতার মৃত্যু হয়েছে। মিস্টার ইংগ্রাম তখনও ইনেজ্কেই ভালোবাসেন, এবং এইরকম সময়ে লেডী মূর এবং তাঁর পুত্র ও কন্যার সঙ্গে এঁদের পরিচয় হয়। বিয়াঙ্কা লেডী মূর-এর পুত্র লর্ড মূরকে ভালোবেসে ফেলেন। লর্ড মূরের সঙ্গে বিবাহে পরিবারের লোকেরা আপত্তি জানান। লর্ড মূর চলে যান ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে। এইখানে গল্পের ছেদ পড়েছে। এই অসমাপ্ত উপন্যাসটি অকারণেই একটু বেশি নাটকীয় ধরনের ও দুঃখময়। সম্ভবতঃ তরুর নিজেরও এটিকে অত্যধিক বিষাদান্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছিল, যেজন্যে এটিকে ছেড়ে দিয়ে ফরাসী উপন্যাসটি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

সেটিতে অন্ততঃ নায়িকার সুখভোগের সময় খানিকটা তবু আছে, যদিও অচিরেই তার অবসান ঘটে। বিয়াঙ্কাতে বড় বোনের মৃত্যুতে তাঁর চিন্তাশক্তি মেঘাবৃত হয়ে যায় এবং তার থেকে যে মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, অরুর মৃত্যুর পর তরুর স্বভাবে সেরকম হওয়া সম্ভব ছিল না।

লোকগীতি ও কাব্যকাহিনী

তরু যখন 'এয়্‌নশেণ্ট্‌ ব্যালাড্‌স্‌ এ্যাণ্ড্‌ লেজেণ্ড্‌স্‌ অব্‌ হিন্দুস্তান'—ভারতের প্রাচীন লোকগীতি ও কাব্যকাহিনী—লিখলেন তখন যে পদ্মফুলটি এতকাল অর্ধবিকশিত ছিল, তা প্রাচ্যের সূর্য্যরশ্মিপাতে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে যতই বেশি তিনি ভালোবেসে থাকুন, অবচেতন মনে এই দুটি দেশকে নিয়ে লিখতে বা তাদের সাহিত্যের অনুবাদ করতে কখনোই পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতেন না, এবং যখন তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের উপবনে তাঁর আর-একটি 'শীফ্‌' বা গুচ্ছ চয়ন করতে ব্রতী হলেন তখনই তাঁর সত্যিকারের কবিসত্তা জাগ্রত হল। এইজন্যেই এড্‌মণ্ড্‌ গস্‌ মন্তব্য করেছিলেন, 'এ শীফ্‌ গ্লিন্‌ড্‌ ইন্‌ ফ্রেঞ্চ্‌ ফিল্‌ড্‌স্‌ নিশ্চয়ই তরুর রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু তাই বলে পড়বার আগ্রহ মনে সবচেয়ে কম জাগায় না।' তরুর মৌলিক ইংরেজী কবিতাগুলি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য: 'আমাদের বিশ্বাস, তরুর মৌলিক ইংরেজী কবিতাগুলি······শেষ পর্য্যন্ত তরুর ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের কাছে হবে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তাদের সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার। এই ব্যালাড্‌গুলি তাঁর সবশেষে লেখা সবচেয়ে বেশি পরিণত রচনা।'

ব্যালাড্‌স্‌-এর প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে লণ্ডনের মেসার্স্‌ কেগান পল এ্যাণ্ড্‌ কম্পানির দ্বারা, ১৮৮১ সালে লেখা এড্‌মণ্ড্‌ গস্‌-এর একটি স্মৃতিভিত্তিক অবতরণিকা সম্বলিত হয়ে। তখন থেকে বইটির আরো পাচটি সংস্করণ ছাপা হয়েছে, শেষেরটি ১৯২৭ সালে এবং সবক'টি একই প্রকাশকদের দ্বারা। আর-একটি সংস্করণ কালিদাস এ্যাণ্ড্‌ কম্পানির দ্বারা মাদ্রাজে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংস্করণটিতে প্রকাশের সাল তারিখ দেওয়া নেই এবং এড্‌মণ্ড্‌ গস্‌-এর অবতরণিকাটিও অনুপস্থিত। প্রকাশকদের একটি মুখবন্ধ দেওয়া হয়েছে, সেটি উল্লেখযোগ্য নয়।

তাঁর স্মৃতিভিত্তিক অবতরণিকায় গস্‌ বলেছেন, 'তরু দত্ত বেঁচে থাকলেও ইউরোপীয় সাহিত্যে যাঁরা স্বীকৃতি লাভ করেছেন, তিনিই আজ হতেন তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তবু যে খ্যাতি ইতিমধ্যেই তিনি প্রভূত পরিমাণে অর্জন

করেছেন তার সবটাই তাঁর জুটেছে মৃত্যুর পরে।' 'ব্যালাড্‌স্' বইটি তরুকে তাঁর নিজস্ব একটি জগতে পৌছে দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখে গেছে।

ই. জে. টমাস মন্তব্য করেছেন, ঠিক কীট্‌স্-এর বেলায় যেমন হয়েছিল, একটা কণ্ঠস্বর ক্রমাগত তরুর কানে ধ্বনিত হয়ে তাঁকে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছিল : 'যা করছ তা তাড়াতাড়ি করে নাও।' এবং অরুর মৃত্যুর পর তরু অনেক বেশি ত্বরান্বিত হয়েছিলেন। 'তবু কাঁচা হাতের পরিচয় ও তাড়া-হুড়োর লক্ষণ বেশ কিছু থাকা সত্ত্বেও এমনও অনেক প্রমাণ বইটিতে রয়েছে যার থেকে মনে হয়, তিনি অল্পকালের মধ্যেই পদ্যছন্দ সংক্রান্ত ত্রুটিগুলির থেকে মুক্ত হতে পারতেন।' তাঁর বড় দোষত্রুটিগুলি অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধরে যেত। কারণ এদের কোনোটিই তাঁর মধ্যে পাকাপাকি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় নি। মিস্টার টমাস আরো বলেছেন : 'তাঁর রচনাগুলির মধ্যে এই ব্যালাড্‌স্ অংশটিরই সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে নিজগুণে অমরত্ব লাভ করবার। ...এগুলি অযত্নে ছড়ানো ছিটানো হলেও সবগুলি একটি একতার সূত্রে গ্রথিত। ...কিন্তু এটা সত্যি কথা যে, অসতর্কতা ছাড়াও, যা তার চেয়েও বেশি মারাত্মক, লেখিকার মধ্যে সহানুভূতির অভাব রয়েছে। বক্তব্য বিষয়গুলি থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, এবং তাদের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেন না।' টমাস এইখানটায় তরুকে খুবই বেশি বৈদেশিকের মতো দৃষ্টি নিয়ে বিচার করেছেন এবং সম্ভবতঃ এটা বুঝতে পারেন নি, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তরু হিন্দু-ধর্মাক্রান্ত বিষয় নিয়ে যখনই লিখতেন, তাঁর বর্ণনায় সেই বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিজেকে অভিন্নাত্মা করে নিতে পারতেন। তাছাড়া ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি বহু পুরনো আদ্যিকালের জিনিস, এবং তাদের 'প্রথম শ্রেণীর মূল্য নেই' এও হতে পারে না। তরু যে কাহিনীগুলি নির্বাচন করেছিলেন সেগুলি বহুপরিচিত এবং সেগুলিতে প্রাচীন সংস্কৃতি ও পুরুষপরম্পরায় পাওয়া বহুমূল্য উত্তরাধিকারের যে পরিচয় রয়েছে তা গ্রীক পুরাণের কাহিনীগুলিরই মতো ঐতিহ্যবাহী। তরু নিজেই এবিষয়ে তাঁর মত প্রকাশ করে গিয়েছেন : 'সংস্কৃত গ্রীকেরই মতো প্রাচীন এবং তারই মতো সমৃদ্ধ একটি ভাষা।' তা ছাড়া আধুনিক লেখকদের তুলনায় অতিরিক্ত এই সুবিধাটি তরুর ছিল যে, ভারতবর্ষের, বাইরের জগৎকে যাঁরা প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সম্পদের সঙ্গে পরিচিত করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। টমাস নিজেই

স্বীকার করেছেন যে, 'তরু সর্বকালের নারীদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেন তাঁদেরই একজন হয়ে রয়েছেন। স্যাফো এবং এমিলি ব্রন্টের পাশে তাঁর স্থান, তাঁদেরই মতো তিনি তেজস্বিনী এবং আত্মার অপরাজেয় শক্তির অধিকারিণী।'

হিন্দু নীতিবাদ সম্পর্কে তরুর চিন্তা সর্বদাই সহানুভূতিশীল, কেবল 'দি রয়্যাল এ্যাসেটিক' (রাজ-তপস্বী) কবিতাটিতে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়, যাঁর বেলায় তাঁর মনে হয়েছে যে তপস্যাব্রতী রাজার উচিত হত না পার্থিব সমস্ত কিছুর সম্বন্ধে ভালোবাসা মন থেকে দূর করে দেওয়া :

তবুও আমরা যারা কিছু বেশি সুখে
বেঁচে আছি দেবতার পবিত্র বিধানে,
আমরা ত জানি, প্রেমরূপী ভগবান্।
বৈরাগ্যের গর্ব হতে জন্ম যে ভক্তির,
তা তাঁর পূজার যোগ্য নয়। তাঁর পূজা
হয় না তপস্যা কিংবা কৃচ্ছ্র সাধনায়।
তাঁর পূজা প্রেমে হয়, যা তাঁর প্রেমের
সমধর্মী, আত্মবোধহীন, সর্বময়।

তরু খুব জোর দিয়ে বলতেন, যে-ব্রাহ্মণ বলতে চেয়েছিলেন যে, রাজা ভরত তাঁর পালিত হরিণীকে খুব বেশি ভালোবেসে পাপ করেছিলেন, তাঁর কথা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। এ ছাড়া আর কোথাও তিনি এমন কিছু বলে যান নি যার থেকে মনে হতে পারে যে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিতার কিছু অভাব ছিল।

মনে হয় সঙ্গত কারণেই টমাস মন্তব্য করেছিলেন যে, তরুর ব্যবহার করা বিশেষণগুলিতে এবং তাঁর চিন্তাধারায় 'মৌলিকতার অভাব এবং অনাবশ্যকতা আছে।' এটা সত্য এবং পরিতাপের বিষয় যে অনেক সময় মিলের খাতিরে অকারণ বিশেষণ ব্যবহারের অভ্যাসটি তরুর ছিল। তাঁর ব্যবহৃত যতিচিহ্নের মধ্যেও কমা, ড্যাশ ও সেমিকোলনের বাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু তাঁর ব্যালাড্-গুলির গতি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, ফরাসীর থেকে অনুবাদগুলির মতো সেগুলি 'খুঁড়িয়ে' চলে না; এবং এগুলিকে প্রায় সৃষ্টির অনুপ্রেরণাজাত বলা চলে।

কীটস্-এর সনেটের কর্টেজের মতো তাঁর সম্মুখে প্রসারিত সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃত সাহিত্যের মহাসমুদ্রের দিকে তরুর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

যখন সে শ্যেনদৃষ্টি হেনে নির্নিমিখে
দেখছিল প্রশান্ত-সিন্ধু,—সাথে যারা ছিল অনুচর
যথেচ্ছ কল্পনা নিয়ে চাইছিল এ উহার দিকে,—
নির্বাক্ সে ডারিয়েনে পাহাড়ের চূড়ার উপর।

আবার সেই কী যে হতে পারত সেই কথাটাই আসছে। কারণ তরু তাঁর নিজের জাতির প্রাচীন সাহিত্যের সমৃদ্ধির আরো গভীরে প্রবেশ করার সময় পেলেন না, তাঁর আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে গেল।

তাঁর দোষক্রটি যদিও আছে—সেগুলির বেশির ভাগের মূলে তাঁর অপরিণত বয়স—তরুর কবিতাগুলিতে বলিষ্ঠতা রয়েছে। ব্যালাড্‌গুলির বহুসংখ্যক মনোরম স্তবকের মধ্য থেকে দুটি স্তবকের নমুনা :

আহা মরি, উষাগমে বনভূমি কী যে মনোরম!
মনোরম যে-ভূমিতে দুপুরের রৌদ্রেরও গরম।
সবচেয়ে মনোরম সূর্য্য চলে গেলে অস্তাচলে
একফালি চাঁদ হাসে যেই-কালে গোধূলির কোলে।
যা-কিছু বন্ধুর সব দুয়ে মিলে সমতল করে,
কোমলতা এনে দেয় রকমারি রঙের উপরে
মেলে আলো-আবরণ, নীলে যার রূপালির ছিট।
ঐ যে পাহাড় যার শিরে তালবনের কিরীট,
তার পাশে বনপ্রান্তে প্রান্তর সুগন্ধে ভরে ওঠে
শিশিরের স্পর্শে যবে কুসুম-কোরকগুলি ফোটে।
পতি আর ভক্তিমতী পত্নী তাঁর, মিলে দুইজনে
প্রবেশ করেন হাত-ধরাধরি সুনিবিড় বনে।

... ...

পৃথিবী কেমন স্থান জানি বলে, জানি কোনোকালে
কামনার ধন কারও পাওয়া হেথা থাকে না কপালে।

কেটেছে পরম সুখে একটি বৎসর কার কবে ?
সোনার মতন করে আমাদেরও অগ্নিশুদ্ধি হবে।
প্রতিটি মানুষ কী যে করে আর মনে ভাবে কী যে,
তার ফল দুঃখ হলে সেই ভার নিতে হবে নিজে।
বন্ধুরা অক্ষম সেথা। যে পাপ হিসাবে আছে ধরা,
যাবে না উড়িয়ে দেওয়া, তাকে নিয়ে বোঝাপড়া করা।
মেনে নিতে হবে সব, যার যা পাপের পরিণতি।
ধর্ম-অনুষ্ঠানে মোর রক্ষা কি পাবেন মোর পতি ?
না গো না, এ অহমিকা, এ কেবল ছলনার কথা ;
চিরবিচারক যিনি, তাঁর কাজে নেই শিথিলতা।

তরুর মনে প্রাচীন ভারতীয়দের কল্পিত দেবতাদের সম্বন্ধেও শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। যম ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রশস্তি তাঁর লেখার সর্বত্রই চোখে পড়ে। একটি প্রাচীন ধর্মমতের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তরুর অবলম্বিত খ্রীষ্টধর্মের কোনো বিরোধ ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃত খ্রীষ্টান, কারণ কোনো ধর্মকেই তিনি ধর্মান্ধতার সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন না। হিন্দু সংস্কৃতিরও তিনি একজন প্রকৃত দুহিতা ছিলেন বলা চলে কেননা তিনি অন্ধবিশ্বাস দ্বারা চালিত হতেন না, উদারচেতা এবং পরমতসহিষ্ণু মানুষ ছিলেন।

যদিও তরুর গাথাগুলি 'হিন্দু মানসিকতা ও ঐতিহ্য দ্বারা ওতপ্রোত' এবং 'যদিও স্বদেশ এবং স্বজাতি তাঁর কবিতার মুখ্য অবলম্বন' তবু কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, তরু সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিসমারোহ ইংরেজীতে আনতে পারেন নি। "প্রাচীন গাথা ও লোককাহিনীগুলি তাদের করুণ সুরের মূর্চ্ছনা অনেকটাই হারিয়েছে, আর হারিয়েছে তাদের সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিসমৃদ্ধ সুরে মণ্ডিত অন্তর্নিহিত সেই মনোহারিত্ব, যা কবির পক্ষে সহজলভ্য তাঁর নিজস্ব তৎসম-শব্দবহুল বাংলা 'সাধু' ভাষায় প্রকাশ পেতে পারত।"

'কল্পিত চরিত্র এবং পরিবেশগুলি তাদের বর্ণাঢ্যতা ও অলঙ্করণের প্রাচুর্য্য হারিয়েছে। অন্য একটি ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে বলে প্রকাশের ভঙ্গিও মনোভাবগুলিতে মরমিতার সুর স্বাভাবিক কারণেই নামিয়ে বাঁধতে হয়েছে। এই অন্য ভাষাটিকে যেমনভাবে খুশি ব্যবহার করার ক্ষমতা যদি তরুর

থাকতও তাহলেও তুলির টানের ও রঙের যে কমনীয়তা ফরাসী ভাষায় তাঁর এসেছিল, এ ভাষাটি তাঁকে তা দিতে পারত না।'[৩৫]

কালিদাস বা বাণ বা অন্য সংস্কৃত গ্রন্থকারদের রচনায় যে অলঙ্কারবহুল শব্দপ্রয়োগ, নায়ক-নায়িকাদের গুণকীর্তনে অতিশয়তা, দেবদেবী ও রাজ-রাজড়াদের ঐশ্বর্য্যবর্ণনার আড়ম্বর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ে, তরু সেগুলির যথাযথ প্রতিফলন তাঁর রচনায় আনতে পারেন নি, তার কারণ, তিনি বিদেশী পাঠকদের উপযোগী করবার জন্যে তাঁর অনুবাদগুলির আধুনিকীকরণ ও সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁকে 'প্রাচীন আদর্শ অনুসারী' আখ্যা দিতে হবে কেননা কাহিনীগুলি প্রাচীন এবং মহাকাব্যের উপাদান। তরু সাহিত্যের সেই পথিকৃৎদের একজন ছিলেন যাঁরা 'বঙ্গদেশকে ইউরোপে যে সময় হীনজ্ঞান করা হত, তাকে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের কাছে উর্ধ্বে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। যে যুগে বাঙালীরা তাঁদের নিজেদের সম্বন্ধে ও তাঁদের দেশ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ ও হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, সে যুগে তিনি বিদেশী আদর্শে কবিতা রচনার পথ ছেড়ে দিয়ে তাঁর স্বদেশের কাহিনী-গুলি নিয়ে লিখতে প্রবৃত্ত হয়ে খুবই সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন বলতে হবে।'[৩৬]

'এয়্‌ন্‌শেণ্ট্‌ ব্যালাড্‌স্‌ এ্যাণ্ড্‌ লেজেণ্ড্‌স্‌ অব্‌ হিন্দুস্তান' বইটির পঞ্চম সংস্করণে যে কাহিনীগুলি আছে তার মধ্যে 'সাবিত্রী' সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। ছন্দোবদ্ধ পদগুলি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে তার বর্ণনা করা হয়েছে এবং আটমাত্রার চৌপদীগুলি একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি। কবিতাগুলিতে মহাকাব্যীয় সমারোহ ও মহনীয়তা যেমন রয়েছে তেমনি সেগুলি গীতধর্মী এবং অনেকাংশে মৌলিক কল্পনা-নির্ভরও বটে।

তরুর অন্য কবিতাগুলি পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির যে স্বতন্ত্র অনুকাহিনীগুলি নিয়ে রচিত, সেগুলি সুনির্বাচিত। যারা সামান্য এবং যারা নগণ্য, তরুর মনের সমস্ত সহানুভূতি তাদেরই জন্যে রাখা ছিল এবং এই সুন্দর কাহিনীগুলি নির্বাচন করেই যেন তিনি সেগুলির মধ্যেকার নৈতিকতার ভাবটিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। 'সাবিত্রী'তে এবং 'সীতা'তেও শুধু পত্নী নয়, নারীত্বেরও আদর্শ কী হওয়া উচিত সে-বিষয়ে ভারতীয় মনোভাবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা তিনি

প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অবিচলিত নিষ্ঠা তরুকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। বইটির দ্বিতীয় কবিতা 'লক্ষ্মণ' 'সাবিত্রী'র মতো এত বড় নয়; এবং এটি সীতা ও তাঁর দেবরের মধ্যেকার একটি কথোপকথন রূপে কল্পিত, যাতে সীতা তাঁর অবিচল কর্তব্যনিষ্ঠ অভিভাবকটির মহৎ চরিত্রের সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন। 'যোগাদ্যা উমা' একটি রূপকথা। এটি তরু তাঁর মায়ের কাছে শুনেছিলেন তা বেশ বোঝা যায়; কারণ, কবিতাটির সমাপ্তির জায়গায় তিনি বলেছেন :

জানি যে এ কাহিনীটি মনে হবে অবিশ্বাস্য
বেমানান চলমান এই পৃথিবীতে ;
তবুও শুনেছি এটি যাঁর মুখ থেকে
বড় প্রিয় সেই মুখ ; তাই যাব রেখে
অন্য কবিতার পাশে একে একভিতে।

কিন্তু গল্পটি বাস্তবিকই বড় মনোরম ; এবং একটি চিত্তাকর্ষক লোক-কাহিনী। 'ভাবটি বড় সুন্দর এবং এইরকমের হাজার হাজার ভাব ছড়িয়ে আছে আমাদের এই ভারতবর্ষে। অত্যন্ত সাধারণ একটি বালিকার ছদ্মবেশে দেবীর আবির্ভাব তরু যথোচিতভাবেই বর্ণনা করেছেন।'[৩৭]

'রাজতপস্বী এবং হরিণী' ও 'ধ্রুব', এই দুটি কবিতা প্রথমে বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। দুটি কবিতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, অন্য কবিতাগুলি যা নয়, এবং কবিতায় ভাবপ্রকাশের এই মাধ্যমটিকে তরু খুব সুষ্ঠুভাবেই ব্যবহার করেছেন। দুটি গল্পই বিষ্ণুপুরাণ থেকে নেওয়া। প্রথমটি হল রাজা ভরতের একটি কাহিনী। ভরত তপস্যাব্রতী অবস্থায় একটি সদ্যভূমিষ্ঠ হরিণীকে সলিল-সমাধি থেকে রক্ষা করেন। তাঁর একক জীবনে এই প্রাণীটিই তাঁর একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠেছিল এবং এটির প্রতি তাঁর এতই মায়া পড়ে গিয়েছিল যে, তাঁর এই মানবিক দুর্বলতা তাঁর ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত অনেক কর্তব্যের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তরু ভালোবাসার দাবিকেই বড় করেছেন, এবং ভারতবর্ষের মুনিঋষিদের দ্বারা পার্থিব জীবনকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানের নৈতিকতা সম্বন্ধে তাঁর সংশয় প্রকাশ করেছেন।

ধ্রুবের কাহিনীটি সুপরিচিত। খুব সহজ ভাষায় তরু এটি বলেছেন এবং এই বলে শেষ করেছেন :

প্রার্থনা ও তপস্যাতে ধ্রুব যে পেলেন উর্ধ্বগতি,
আকাশের তুঙ্গশীর্ষে স্থিতি তার হল পরিণতি
জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের রূপে। তাঁকে দেখে প্রতি রাতে
পৃথিবীর নরনারী অন্তরীক্ষে তারার সভাতে।

তরুর পরের কবিতাটি বট্টু, একটি ব্যাধ বালককে নিয়ে লেখা। বালকটির মনে বাসনা সে স্বয়ং দ্রোণাচার্য্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করবে। আচার্য্যের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং তাঁর রাজকুলজাত শিষ্যদের কাছে অপমানিত হয়ে সে একটি অরণ্যের নিভৃতে গিয়ে দ্রোণের একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করল ; এবং সেই মূর্তির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির সহায়তাতেই তাঁর সমস্ত বিদ্যা অধিগত করে নিল। কিন্তু যেহেতু এই বীরধর্মী তরুণ তার গুরুকে দক্ষিণারূপে নিজের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কোনো বস্তু দান করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল, তার রাজকুলজাত প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন সে কথা তাকে মনে করিয়ে দিলে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে সে নিজের অধিগত বিদ্যাটিকেই গুরুদক্ষিণা বলে বলি দিয়ে দিল। দ্রোণাচার্য্য এজন্যে তাকে আশীর্বাদ করে বললেন :

এক সিন্ধুতীর হতে অন্য সিন্ধুতীরে
যশ বয়ে নিয়ে যাবে তব সুখ্যাতিরে।
আত্মনির্ভরতা আর সত্যনিষ্ঠা, বিনয়নম্রতা,
তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত রবে এ তিনটি কথা
মানুষের মনে চিরকাল।

তরুরও সুখ্যাতি এইভাবেই প্রসারিত হয়েছে। তাঁর যশ এক শতাব্দীরও বেশি স্থায়ী হয়েছে, এবং আরও বহুকাল তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। 'স্বদেশের মহৈশ্বর্য্যের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর যে গর্ববোধ ছিল সেখানে নিজের ভারতীয়ত্ব ছিল তাঁর মজ্জাগত।' ভারতবর্ষের সম্পদের এই উত্তরাধিকারে তাঁর নিজের অর্জিত ঐশ্বর্য্য যুক্ত হয়েছে, যার সাহায্যে মহাকালের তোরণশোভিত জয়যাত্রার পথে নিজের দেশকে তিনি এগিয়ে নিয়ে এসেছেন, আর এই কারণেই তাঁর নাম

চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'তরু' এই নামটি নিয়ে যে স্পর্শকাতর, একটু অচেনা ধরনের ফুলটি অল্পসময়ের জন্যে বিকশিত হয়েছিল তা যে সৌরভ রেখে গিয়েছে তা কোনোকালে নিঃশেষ হয়ে যাবে না।

ব্যালাড্‌গুলির শেষের দিকে তাঁর যে 'বিবিধ কবিতা' ছাপা হয়েছিল তার মধ্যে 'আওয়ার ক্যাজেওআরিনা ট্রি' কবিতাটি তাঁর নিজের শেষ কথাটিকেই যেন সার্থকতা দিয়ে গিয়েছে : 'বিস্মৃতির অভিশাপ থেকে বাঁচাবে আমার প্রেম তোমাকে আড়াল করে রেখে।' এই কবিতাটি বিস্মৃতির অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েই রয়েছে, এটির উদ্ধৃতি প্রায়ই চোখে পড়ে, এবং ই. জে. টমাস-এর কথায়, 'এটি নিঃসন্দেহে বিদেশীদের দ্বারা রচিত সর্বকালের ইংরেজী কবিতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়বার মতো'। তরুর এই কবিতাটিতে অতীতের দিনগুলির মধ্যে ফিরে বাঁচবার জন্যে আকুলতা এবং একটি মহনীয় অপার্থিব সৌন্দর্য-স্বপ্ন দেখতে পারার মতো আন্তরদৃষ্টির পরিচয় আছে বলেই তাঁর সব কবিতার মধ্যে এটিতে তার মধ্যেকার মানুষটাকে বেশি অন্তরঙ্গ করে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই একটি কবিতা দ্বারাই তিনি তাঁর সমসাময়িক অমর ইংরেজ কবিদের সমকক্ষ একজন রূপে পরিগণিত হবার যোগ্যতা লাভ করেছেন।

অতিকায় অজগর সর্প সম পাকে পাকে ঘিরে
বহু ক্ষতচিহ্নে ভরা বৃক্ষটির রুক্ষ দেহটিরে,
উঠে গেছে লতা এক শীর্ষে তার, তারাদের কাছে ,
এমন বেষ্টনে বেশী গাছের ক্ষমতা নেই বাঁচে।
কিন্তু এ বিশাল তরু, বীরোচিত তার আচরণ,
রাখে তাকে দেহ ঘিরে। লতাটিতে লোহিত বরণ
থোকা থোকা ফুল ফোটে, তার শাখা-প্রশাখার ফাঁকে,
পক্ষী মধুমক্ষিকারা সারাক্ষণ ভিড় করে থাকে।
কতবার নিশাকালে উপচিয়া সারাটা বাগান
গাছ থেকে ভেসে আসে মধুর আঁধারমাখা গান।
মনে হয় সেই গান থামবে না যেন কোনোদিন
কোনোকালে। সে-সময়ে মানুষেরা নিদ্রায় নিলীন।

যখন প্রভাতে উঠে প্রথমেই খুলি বাতায়ন.
এরই 'পরে দৃষ্টি পড়ে, দেখি আর জুড়ায় নয়ন।
কোনো-কোনোদিন দেখি, বেশি দেখি শীতের সকালে,
ধূসর বানর এক বসে আছে এর মগডালে
নিথর পাথরমূর্তি। সূর্যোদয় দেখে সে একেলা,
নীচে ডালে ডালে তার ছানাটি লাফিয়ে করে খেলা।
প্রভাতের আগমনী পিক-কণ্ঠে শুনি চারিভিতে,
নিদ্রালু গাভীরা চলে শ্লথপদে চারণ-ভূমিতে।
বিরাট্ সুন্দর বৃদ্ধ বৃক্ষটির নীচে ছায়াতলে
জমাট তুষার-সম কুমুদেরা ফোটে দীঘিজলে।

এই যে প্রাচীন বৃক্ষ, প্রাণপ্রিয় নয় মোর কাছে
মহৈশ্বর্য্যময় বলে শুধু। এর ছায়াতলে আছে
অনেক খেলার স্মৃতি। বর্ষ পরে বর্ষ হবে গত,
খেলার সাথীরা মোর মধুস্মৃতি, গভীর যে কত
তোমাদের তরে মোর ভালোবাসা! তোমাদেরে ভেবে
এ হৃদয় গাছটিরে আমরণ ভালোবাসা দেবে।
স্মৃতিতে যে মূর্তিগুলি তোমাদের ধরা আছে. তারা
মিলে গিয়ে এর সাথে দুচোখে বহাবে অশ্রুধারা।

অন্ত্যেষ্টির স্তোত্র সম এ কী শুনি মৃদু অনাহত
ধ্বনি, সিন্ধু শিলাতটে চলোর্মির উচ্ছ্বাসের মতো।
এ যে গাছটির শোক ; অপার্থিব এ শোকের ভাষা
পৌছবে অজানা লোকে, বুঝি তার আছে সেই আশা।

অজানা, তবুও যারা বিশ্বাসে অটল তারা জানে।
এই বিলাপের ধ্বনি আমি ত শুনেছি কতখানে
দেশে দেশান্তরে, উপসাগরের সৈকতে নিরালা
গুহাতে ঘুমায় যেথা জলপ্রেত, আর বীচিমালা

অবিক্ষুব্ধ শান্তগতি, এসে মৃদু মৃদু চুমো খায়
ঐতিহ্যমণ্ডিত ফ্রান্স, ইটালীর তট-বালুকায়।
যে সময় চাঁদ ওঠে, পান করে তার জ্যোৎস্নাধারা
স্বপ্নহীন কোন্ মোহে পড়ে রহে ধরা সংজ্ঞাহারা।

যতখানে যতবার শুনেছি এ মর্মরিত ধ্বনি,
বিরাট্ মহান্ এক মূর্তি মনে জেগেছে তখনি।
সে তোমারই মূর্তি বৃক্ষ! দেখেছি যেমন পড়ে মনে,
বড় প্রিয় নিজ দেশে, সুখময় প্রথম জীবনে।

তাই ত আমার মনে, বৃক্ষ, আজ জেগেছে আগ্রহ
কাব্যছন্দে রেখে যেতে উৎসর্গিয়া তব স্মৃতিবহ
শ্রদ্ধা-নিবেদন মোর। ছিলে প্রিয় আত্মীয়ের মতো
যাদের, তারা ত সবে স্বর্গসুখে চির নিদ্রাগত।
তারা ছিল আমারও যে প্রাণাধিক প্রিয়। আমি চাই,
ফুরালে আমার দিন তুমি, বৃক্ষ, পাও যেন ঠাঁই
মৃত্যুহীন বৃক্ষদের পাশে। ব্যারোডেলের বৃক্ষেরা
যেমন মরণজয়ী ; যেথা করে যেত ঘোরাফেরা
ভয়াল শাখার ছায়ে এসে জুটে ভয়ে ম্লান 'ভয়,
আশা কম্প্র-কলেবর, মৃত্যু যার রূপ অস্থিময়,
ছায়ারূপী কাল।' জানি, দুর্বল এ কবিতার ভাষা,
তবুও তোমার রূপ বর্ণিবে সে এই তার আশা।
আরো এই আশা আছে, বিস্মৃতির অভিশাপ থেকে
বাঁচাবে আমার প্রেম তোমাকে আড়াল করে রেখে।

বইয়ে সংখ্যা-চিহ্নিত অংশগুলির টীকা ও উদ্ধৃতিপরিচয়

১ ১৯২১ সালে অক্স্‌ফর্ড্‌ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হরিহর দাসের লাইফ এ্যাণ্ড্‌ লেটার্স্‌ অব্‌ তরু ডাট্—তরু দত্তের জীবনী ও পত্রাবলী,—গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় সাপ্লিমেণ্টারি রিভিউ,—সম্পূরক সমালোচনা-রূপে উদ্ধৃত। লণ্ডন কোয়ার্টার্লি রিভিউয়ে ই জে টমাস লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

২ ইণ্ডিয়ান লিটেরেচার পত্রিকার ১৯৬৬, এপ্রিল-জুন সংখ্যায় অলোক-রঞ্জন দাশগুপ্তের লেখা দি ফ্র্যাজাইল ব্লসম্—অতি সুকুমার কুসুমটি—শীর্ষক প্রবন্ধ।

৩ কে আর শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার প্রণীত ইণ্ডিয়ান রাইটিং ইন্ ইংলিশ,—ভারতীয়দের ইংরেজী রচনা,—এশিয়া পাব্‌লিশিং হাউস, বোম্বাই, ১৯৬২। পৃঃ ৫১ এবং ৫৬।

৪ তরু দত্ত রচিত এয়্‌ন্‌শেণ্ট্‌ ব্যালাড্‌স্ এ্যাণ্ড্‌ লেজেণ্ড্‌স্ অব্‌ হিন্দুস্তান,—হিন্দুস্তানের প্রাচীন লোকগীতি ও প্রাচীন লোক-কাহিনী। কেগান পল, ট্রেঞ্চ্‌ ট্রুব্‌নার এ্যাণ্ড্‌ কম্পানী লিঃ, লণ্ডন। ১৯২৭। পৃঃ এক্‌স-এক্‌স্-এক্‌স্-আই-আই এবং এক্‌স্-আই-ভি।

৫ হরিহর দাসের লাইফ এ্যাণ্ড্‌ লেটার্স্‌ অব্‌ তরু ডাট্ বইটিতে রাইট অন্‌ব্‌ল্ এইচ এ এল ফিশার লিখিত ভূমিকা। পৃঃ ভি-আই-আই।

৬ ঐ। পৃঃ ১।

৭ মিঃ জে এন গুপ্ত প্রণীত লাইফ্‌ এ্যাণ্ড্‌ ওয়ার্ক্‌ অব্‌ রমেশ চন্দর ডাট্, সি-আই-ই,—রমেশচন্দ্র দত্ত, সি-আই-ই-র জীবন কার্য্যকলাপ। জে এম্ ডেণ্ট্‌, লণ্ডন। পৃঃ ৩।

৮ হরিহর দাসের লাইফ এ্যাণ্ড্ লেটার্স্ অব্ তরু ডাট্, তৃতীয় সংযোজন। তরুর মায়ের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বিশপ ক্লিফর্ড বলেছেন, 'তাঁর স্বামীর মৃত্যুর সময় বিশ্বাসের শক্তিতে দুঃখকে বশে আনতে পারায় পরিতৃপ্তির যে মুখভাবটি তাঁর আমি দেখেছিলাম তা কখনো ভুলব না। আত্মসমর্পণের অনেক উপরে একটি অফুরন্ত শক্তির উৎস, আধ্যাত্মিক একটি আনন্দলোকে তিনি পৌছতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজের শেষ দিন যখন এগিয়ে আসতে লাগল, তখনও এই বিশ্বাস ও সাহস তাঁকে পরিত্যাগ করে যায়নি। তাঁর দৈহিক যন্ত্রণা (তিনি ক্যান্সার রোগে মারা যান) নিশ্চয় এমন ছিল যা কল্পনা করতেও মন চায় না। কিন্তু তিনি একবারও ভয়ে বিচলিত হননি বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন নি। বরিশালে (যে শহরটি এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) দেশের সবচেয়ে সুন্দর অন্যতম গীর্জাটি, চার্চ্ অব্ দি এপিফ্যানি, নির্মাণের কাজে তিনি অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন।

৯ লাইফ্ এ্যাণ্ড্ ওয়ার্ক্ অব্ রমেশ চন্দর ডাট্, পৃঃ ৪।

১০ ব্যালাড্স্, পৃঃ ৭৯, ৮০।

১১ ব্যালাড্স্, পৃঃ ১৩৫।

১২ লাইফ্ এ্যাণ্ড্ লেটার্স্ অব্ তরু ডাট্, দ্বিতীয় সংযোজন. পৃঃ ৩৫৬।

১৩ লাইফ্ এ্যাণ্ড্ লেটার্স্ অব্ তরু ডাট্, পৃঃ ২১।

১৪ এসেই অ লিটেরেট্যুর আঁগ্লে র ২৭১ পৃঃ থেকে লাইফ্ এ্যাণ্ড্ লেটার্স্ অব্ তরু ডাট্-এর ২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৫ লাইফ্ এ্যাণ্ড্ লেটার্স অব্ তরু ডাট্, পৃঃ ২১। কোনো কোনো জীবনীকার লিখেছেন, দত্তরা ইটালীতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মিসেস বার্টনের এই কথাগুলি থেকে মনে হয় ইটালীতে তাঁরা যাননি। যদি যেতেন ত রোম না দেখে ফিরেছিলেন এটা ভাবা যায় না। এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ চোখে পড়ে না যার থেকে মনে হতে পারে, তরু কখনো রোমে গিয়েছিলেন।

১৬ বেঙ্গল ম্যাগাজিন, জুন, ও জুলাই, ১৮৭৫।

১৭ ব্যালাড্স্, পৃঃ ১২৯, ১৩০।

১৮ লাইফ্ এ্যাণ্ড্ ওয়ার্ক্ অব্ রমেশ চন্দর ডাট্, পৃঃ ৪।

১৯ লাইফ এ্যাণ্ড লেটার্স্ অব্ তরু ডাট্, পৃঃ ২৩।

২০ ব্যালাড্স্, পৃঃ ১২২, ১২৩।

২১ ল্য জুর্ন্যাল দ্য মাদ্‌মআজেল দ্যার্ভেয়্র্-এর ভূমিকা।

২২ ব্যালাড্স্, পৃঃ এক্স্-আই-আই-আই।

২৩ অরিয়েণ্টাল গ্রন্থমালায় রিনেয়্স্যান্স্ সংস্করণের তৃতীয় গ্রন্থ, দি লিটেরেচার অব্ ইণ্ডিয়া। কলোনিয়াল প্রেস, এন্-ওয়াই, লণ্ডন, ১৯০০। জুলিয়ান হথর্ন্ সম্পাদিত।

২৪ ব্যালাড্স্, পৃঃ এক্স্-আই-ভি।

২৫ ডঃ ডাফ্-এর ছাত্র মিঃ লালবিহারী দে ছিলেন দত্তদেরই মতো প্রাথমিক যুগের একজন ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ফ্রি মিশন চার্চের যাজক হয়েছিলেন। সুলেখক বলে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল এবং একবার ইংরেজীতে একটি উপন্যাস লিখে তিনি ৫০ পাউণ্ড পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি বেঙ্গল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হন, এবং ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত সেই কাজে নিযুক্ত থাকেন। রেভারেণ্ড দে দুটি বহুখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা, তার একটি বেঙ্গল পেজ্যাণ্ট্ লাইফ্,—বাঙালী কৃষকদের জীবনযাত্রা, আর একটি ফোক টেল্স্ অব্ বেঙ্গল—বাংলার রূপকথা। অরু ও তরুর কবিতার একজন বড় সমঝদার ছিলেন তিনি।

২৬ তরু দত্তের এ শীফ্ গ্লিন্ড্ ইন ফ্রেঞ্চ্ ফিল্ড্সের-এর, ১৮৭০ সালে ভবানীপুর সাপ্তাহিক প্রেসে মুদ্রিত ও বি এম বোস প্রকাশিত একটি নূতন সংস্করণ।

২৭ শিলার্-এর কবিতার মূল জার্মান পঙ্‌ক্তি কটি :

Ich bringe Blumen mit und Fruehte
Gereift auf einer andern Flur,
In cinem andern Sonnenlichte,
In einer glucklichern Natur.

২৮ লাইফ এ্যাণ্ড্ লেটার্স্ অব্ তরু ডাট্ বইটিতে ই জে টমাস-এর লেখা সাপ্লিমেণ্টারি রিভিউ। পৃঃ ৩৪৫।

২৯ ব্যালাড্‌স্, পৃঃ একস্-ভি-আই।

৩০ ব্যালাড্‌স্, পৃঃ ঐ।

৩১ ল্য জুর্ন্যাল দ্য ম্যাদ্‌মআজেল দ্যার্‌ভেয়্‌র্। তরুর জীবন ও রচনাবলী সংক্রান্ত ক্ল্যারিস্ বাদে লিখিত স্মৃতিকথা সম্বলিত। দিদিয়ে এ কঁপানি প্যারিস, ১৮৭৯। লর্ড লিটনকে উৎসর্গ করা।

৩২ প্যারিসের প্রাচ্য-ভাষা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক গার্সঁ্যা দ্য তাসি ছিলেন প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে একজন নামকরা বিশেষজ্ঞ। ভারতবর্ষের নারীদের শিক্ষায় অগ্রগতি বিষয়ে জানবার জন্যে খুবই বেশি ঔৎসুক্য ছিল তাঁর মনে। সংস্কারক হিসাবে ভারতবর্ষে তখন মেরি কার্পেণ্টারের খুবই সুনাম। অধ্যাপক ত্যাসি তাঁকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনি ক্ল্যারিস্ ব্যাদেরও বন্ধু ছিলেন, এবং তরুর শীফ্ বইটি খুব আগ্রহসহকারে পাঠ করেছিলেন। ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি চিঠিতে ক্ল্যারিস্ তরুকে লিখছেন, 'কাল সন্ধ্যায় তোমার চিঠিটি এবং তোমার মনোরম কবিতা-সঙ্কলনটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ গার্সঁ্যা দ্য ত্যাসিকে দেখতে দিয়েছিলাম।...ইনি তোমাদের প্রতিবেশী সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একজন বন্ধু।'

৩৩ 'কবি তরু দত্ত,' রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা বাংলা বই।

৩৪ বেঙ্গল ম্যাগাজিন, এপ্রির্ল, ১৮৭৮।

৩৫ 'লিটেরেরি হিস্টরি অব্ ইণ্ডিয়া', আর ডব্লিউ ফ্রেজার প্রণীত। ফিশার আন্উইন, ১৮৯৮। পৃঃ ৪৩২।

৩৬ 'দি রিনেয়্স্যান্স্ অব্ ইণ্ডিয়া'—ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির নবজীবন। লণ্ডন, ১৯১২।

৩৭ ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা ইণ্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিনে শ্রীমতী কমলা সত্যনাদনের তরু দত্ত সম্বন্ধীয় নিবন্ধ।

এই পুস্তিকা রচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থাদি

তরু দত্ত প্রণীত কবিতা-সঙ্কলন 'এ শীফ্ গ্লিন্ড্ ইন ফ্রেঞ্চ্ ফিল্ড্স্', ফ্রান্সের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আহরণ করা একটি গুচ্ছ। সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস, ভবানীপুর, কলকাতা, ১৮৭৬।
একই প্রকাশকদের দ্বারা প্রকাশিত আর একটি সংস্করণ, ১৮৭৮।
লণ্ডনের কেগান পল এ্যাণ্ড্ কম্পানি দ্বারা প্রকাশিত একটি সংস্করণ, ১৮৮০।

তরু দত্ত প্রণীত 'এয়্ন্শেণ্ট্ ব্যালাড্স্ এ্যাণ্ড্ লেজেণ্ড্স্ অব্ হিন্দুস্তান'—হিন্দুস্তানের প্রাচীন লোকগীতি ও প্রাচীন লোককাহিনী, কেগান পল্ এ্যাণ্ড্ কম্পানি, লণ্ডন, ১৮৮২।
একই প্রকাশকদের দ্বারা প্রকাশিত আর একটি সংস্করণ, ১৮৮৫।
মাদ্রাজের কালিদাস এ্যাণ্ড্ কম্পানি দ্বারা প্রকাশিত একটি সংস্করণ। প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।

তরু দত্তের ফরাসী ভাষায় লেখা উপন্যাস, 'ল্য জুর্ন্যাল দ্য ম্যাদ্মআজেল্ দ্যারভেয়্র্'—কুমারী দ্যার্ভেয়্র্-এর দিনলিপি। মাদ্মআজেল্ ক্ল্যারিস্ বাদে লিখিত স্মৃতিকথা সম্বলিত। দিদিএ, প্যারিস, ১৮৭৯। বাংলা অনুবাদ, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৪৯; পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৮।

তরু দত্ত প্রণীত ইংরেজী অসম্পূর্ণ উপন্যাস, 'বিয়াঙ্কা অর্ দি ইয়ং স্প্যানিশ মেয়্ডেন'—বিয়াঙ্কা নাম্নী একটি অনূঢ়া স্প্যানিশ তরুণী। ১৮৭৮ সালের বেঙ্গল ম্যাগাজিনে এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসটির আটটি পরিচ্ছেদ জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত চার মাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

তরু দত্ত সঙ্কলিত 'এ সিন্ ফ্রম্ কন্টেম্পরারি হিস্টরি'—ঐতিহাসিক মূল্যের একটি সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। য়ুগো এবং তিয়ে-র কতগুলি বক্তৃতার

ও কবিতার ফরাসী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ। ১৮৭৫ সালে বেঙ্গল ম্যাগাজিনের জুন ও জুলাই সংখ্যায় ছাপা হয়।

তরু দত্তের প্রবন্ধ—একটি হেনরী লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও সম্বন্ধে, অন্যটি ল্যকঁৎ দ্য লীল্ সম্বন্ধে। দুটি প্রবন্ধই ১৮৭৭ সালে বেঙ্গল ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

তরু দত্তের বিভিন্ন রচনা যে-সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাদের নাম-ধাম: স্যাটারডে রিভিউ, লণ্ডন, ১৮৭৯। লা গ্যাজেত্ দ্য ফ্রাঁস্, প্যারিস, জানুয়ারী, ১৮৭৯। লা পতেক্ষ্যয়্, এ্যামস্টার্ডাম, অক্টোবর, ১৮৭৯। লা গ্যাজেত্ দ্য ক্যাম্, প্যারিস, ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৯। দি ইংলিশম্যান, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল, ১৮৭৬ এবং ২১ মার্চ, ১৮৭৯। দি স্টেট্সম্যান, কলকাতা, ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৭, ১৫ জুলাই, ১৮৭৮, এবং ৩১ মার্চ, ১৮৭৯। দি এগ্জামিনার, লণ্ডন, অগস্ট, ১৮৭৬ এবং জুন, ১৮৭৮। রেভ্যু দে দ্যো ম দ্, প্যারিস, ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭ এবং ১ এপ্রিল, ১৮৭৮। এছাড়াও অন্য কতগুলি পত্র-পত্রিকা। সম্পূর্ণ তালিকা হরিহর দাসের লাইফ এ্যাণ্ড্ লেটার্স্ অব্ তরু ডাট্, এ্যাপেণ্ডিক্স্ চার-এ পাওয়া যাবে।

তরু দত্তের লেখা মার্চ ১৮৭৩ থেকে এপ্রিল ১৮৭৮ পর্য্যন্ত বেঙ্গল ম্যাগাজিনে নিয়মিত ছাপা হয়েছিল। দি ক্যাল্কাটা রিভিউয়েও প্রায়ই তাঁর লেখা ছাপা হত।

তরু দত্ত রচিত কবিতা 'সাবিত্রী', ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের পাঠ্য হয়েছিল। সম্পাদক জে পি সিন্হা। প্রকাশক স্টুডেন্ট্স্ পাব্লিশার্স্, মীরাট, ১৯৫৬।

'লাইফ এ্যাণ্ড্ লেটার্স্ অব্ তরু ডাট্'—তরু দত্তের জীবনী ও পত্রাবলী। হরিহর দাস প্রণীত। রাইট অন্ব্ল্ এইচ এ এল, ফিশার লিখিত ভূমিকা সহ। অক্স্ফর্ড্ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২১।

'দি বেঙ্গলী বুক অব্ ইংলিশ ভার্স্'—বাঙালীদের রচিত ইংরেজী কবিতার বই। থিঅডোর ডাগ্লাস ডান্ কর্তৃক নির্বাচিত এবং রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। লংম্যান্‌স্ গ্রীন এ্যাণ্ড্ কম্পানি, মাদ্রাজ, ১৯১৮।

'ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশন ইন তরু ডাট্'স্ পোএট্রি'—তরু দত্তের কবিতায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। হরিহর দাস প্রণীত। ১৯৩১ সালের অক্টোবর এশিয়াটিক রিভিউ-এ এবং একটি পুস্তিকারূপে ছাপা হয়েছিল।

'ইণ্ডিয়ান রাইটার্স্ অব্ ইংলিশ ভার্স্'—ইংরেজীতে কবিতা রচয়িতা কয়েকজন ভারতীয়। শ্রীমতী লতিকা বসু লিখিত। ১৯৩৩।

'কবি তরু দত্ত' (বাংলা) রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক এশিয়া পাব্লিশিং হাউস, কলকাতা। বঙ্গাব্দ ১৩৬৬।

'দি ওআর্ল্ড'স্ গ্রেট ক্লাসিক্যাল রিনেয়্স্যান্স্'—প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত বিশ্বসংস্কৃতির নবজন্ম। দি কলোনিয়াল প্রেস, নিউ ইয়র্ক্, তৃতীয় খণ্ড, ভারতীয় সাহিত্য।

'দি রিনেয়্স্যান্স্ ইন ইণ্ডিয়া'—ভারতবর্ষে প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত সংস্কৃতির নবজন্ম। লণ্ডন, ১৯১২।

'ইণ্ডিয়ান কন্ট্রিবিউশন টু ইংলিশ লিটেরেচার'—ইংরেজী সাহিত্যে ভারতীয়দের দান। কে আর শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার। ১৯৪৫।

'ইণ্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশ'—ভারতীয়দের ইংরেজী রচনা। কে আর শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার প্রণীত। এশিয়া পাব্লিশিং হাউস, ১৯৬২।

'ইণ্ডিয়ান লিটেরেচার'। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দীপেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক নির্বাচিত তরু দত্তের কিছু রচনা। সাহিত্য অকাদেমি, এপ্রিল-জুন ১৯৬৬।

'লাইফ এ্যাণ্ড্ ওআর্ক্ অব্ রমেশ চন্দর ডাট্'—রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী ও কার্য্যকলাপ। জে এন গুপ্ত প্রণীত। জে এম ডেন্ট্, লণ্ডন, ১৯১১।

'পোএম্‌স্ বাই ইণ্ডিয়ান উইমেন'—ভারতীয় নারীদের রচিত (ইংরেজী) কবিতা, মার্গারেট ম্যাক্‌নিকল সম্পাদিত। এ্যাসোসিয়েশন প্রেস, ওআই-এম্-সি-এ, কলকাতা এবং অক্‌স্‌ফর্ড্ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৩।

'গ্রেট উইমেন অব্ ইণ্ডিয়া'—ভারতের মহীয়সী মহিলারা। পূতস্মৃতি শ্রীশ্রীমাতার (সারদামণি দেবীর) জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া।

'পায়োনিয়ার উইমেন অব্ ইণ্ডিয়া'—যে ভারতীয় নারীরা পথ দেখিয়েছেন। শ্রীমতী পদ্মিনী সেনগুপ্ত প্রণীত। থ্যাকার, বোম্বাই, ১৯৪৪।

দি ইণ্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিন, সম্পাদিকা শ্রীমতী কমলা সত্যনাদন। ১৯০১-১৯৩৪। তরু দত্তের কবিতা প্রায়শঃই ছাপা হত, এবং অনেকগুলি সংখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।

অন্‌ওয়ার্ড্, জুন, ১৯৪৭, নাজু বিলিমরিয়া লিখিত 'তরু ডাট্'।

ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি অব্ ইণ্ডিয়া,

৪ মার্চ, ১৯৫৬, 'তরু ডাট্'। লেখক নাজু বিলিমরিয়া।

৫ জুলাই, ১৯৩৫, 'ইণ্ডিয়ান রাইটার্স্ অব্ ইংলিশ ভার্স্' ইংরেজীতে কবিতা রচয়িতা কয়েকজন ভারতীয়। লেখক জেনাস্।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৬১, 'এ নেস্ট্ অব্ সিঙ্গিং বার্ড্‌স্', সুকণ্ঠ পাখীদের নীড়। লেখক রাজারাও।

দি স্টেট্‌স্‌ম্যান, ১৪ মার্চ, ১৯৫৪, 'তরু ডাট্'। লেখক ইজ্জৎ ইয়ার খাঁ।

দি টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া, ৭ মার্চ, ১৯৫৪, 'এ গিফ্‌টেড্ পোএটেস্', একজন শক্তিমতী নারী কবি। লেখক অনন্ত।

অনুবাদকের নিবেদন

'ফ্রান্স' অধ্যায়ে এবং এর পরবর্তী 'ইংলণ্ড' অধ্যায়ে (শহর ক'টির নাম ইংরেজী হবে) ফরাসী-দেশীয় কয়েকজন ব্যক্তির নাম ও কয়েকটি ফরাসী শব্দের বানানে যে রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে পরেকার অধ্যায়গুলির অনু-বানানের রীতির কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যাবে। ভুল হলেও, পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষার জন্যে পরেকার রীতিই সর্বত্র অনুসৃত হোক এই আমার কাম্য। এজন্যে পূর্বেকার বানানগুলির সংশোধিত রূপ হতে হবে এই প্রকার :

পৃষ্ঠা	ছত্র	ছাপা হয়েছে	সংশোধিত রূপ
১৬	১০	মাদ্‌মোআজেল ক্লারিস্	ম্যাদ্‌মআজেল্ ক্ল্যারিস্
২৮	১	মার্সেইলে	মার্সেইল্‌জে
„	২	পাসিওন্না	পাসিয়না
„	৭	মাদাম শোয়াইয়ে	ম্যাড্যাম শআয়ে
২৯	২১	জুর্নাল	জুর্ন্যাল
„	„	মাদ্‌মোআজেল	ম্যাদ্‌মআজেল্
„	„	দার্‌ভেয়্‌র্	দ্যার্‌ভেয়্‌র্
„	২২	মার্‌গ্যেরিত্	ম্যার্‌গ্যেরিত্
৩০	৩	প্রম্‌নাদ্ আংলেতে	প্রম্‌ন্যাদ্ দেজাঁগ্‌লেতে
„	২১	পারি	প্যারিস্
৩১	৭	„	„
„	১০	„	„
„	„	পারিতে	প্যারিসে
„	১৭	মার্সেইল্	মার্সেইল্‌জ্
৩২	১	মাদ্‌মোআজেল্	ম্যাদ্‌মআজেল্
„	১৬	নাপলিয়ঁ	ন্যাপলেওঁ

পৃষ্ঠা	ছত্র	ছাপা হয়েছে	সংশোধিত রূপ
,,	১৭	যুগের	য়ুগোর
,,	২১	ম্‌সিয়	মসিয়ু/ম্‌সিয়ু
৩৬	২৩	মাদ্‌মোআজেল	ম্যাদ্‌মআজেল
৩৯	৪	পোএর	পোএর-এর
,,	২২	ম্‌সিয়	মসিয়ু/ম্‌সিয়ু
৪১	৩	মাদ্‌মোআজেল্	ম্যাদ্‌মআজেল